অন্যরকম আটদিন

১-২. পরীক্ষার ফল

ওদের দুজনের পরীক্ষার ফল যে ভালো হবে না এ কথা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলো জয় আর টুপুল। ফল বেরোবার দিন দুজন একসঙ্গে এসেছে স্কুলে। দুজনের মুখই শুকনো। অন্যদিন ক্লাস শুরু হয় দশটায়, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট যেদিন দেয়া হয় সেদিন অন্য কোনো ক্লাস হয় না। একটাই পিরিয়ড, শুরু হয় নটায়। ওরা আটটার সময় স্কুলে এসে চুপচাপ বসেছিল ফুটবল খেলার মাঠের এক কোণে ঘন সবুজ, বকুল গাছটার তলায়।

ঢং ঢং করে ক্লাস শুরুর ঘন্টা বাজালো বুড়ো ধনাই। ওদের মনে হলো বুকের ভেতর কেউ যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। ঘন্টা থেমে যাওয়ার পর ওরা যখন ক্লাসে ঢুকলো তখনও বুক ঢিব ঢিব করছিলো।

লক্ষ্মীবাজারের এই মিশনারি স্কুলটায় জয় আর টুপুল ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে পড়ছে। সুত্রাপুরের একই পাড়ায় বাড়ি, স্কুলে আসে একসঙ্গে, ক্লাসে বসে একসঙ্গে, বাড়ি ফেরে একসঙ্গে। পাড়ার সবাই এমন কি ক্লাসের টিচাররা পর্যন্ত ওদের ডাকেন মানিকজোড় বলে। লেখাপড়ায় আহামরি ভালো ছাত্র না হলেও ওদের ছাড়া ফুটবল টিম অচল। একজন লেফট ব্যাক, আরেকজন রাইট ব্যাকে দু বছর ধরে স্কুল টিমে খেলছে।

জয় আর টুপুল বসেছিল ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে। সামনের বেঞ্চে ভালো ছেলেরা বসে। ফাস্ট বেঞ্চে শাহেদ, বাবু, কবিররা হাসাহাসি করছিলো নিজেদের মধ্যে। প্রথম তিনটে প্লেস ওদের তিনজনের বাইরে যায় না। মনিটর টুলু চাপা গলায় বললো, স্যার আসছেন, সবাই চুপ।

হালকা মেজাজে ক্লাসে ঢুকলেন পি ডি কস্টা স্যার। ইশারায় ওদের বসিয়ে মৃদু হেসে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, আশা করি ক্লাস নাইনে এটাই তোমাদের শেষ ক্লাস, যদি না কেউ ফেল করো।

টুলু দাঁড়িয়ে নিরীহ গলায় জানতে চাইলো–আমাদের ক্লাসে কি এবার কেউ ফেল করেছে?

ফেল করাটা অভিনব কোনো ঘটনা নয়। সেভেন থেকে এইটে উঠতে গিয়ে তিনজন ফেল করেছে। ওরা ক্লাস নাইনে উঠে আগের বছরের ফেল করা দুজনকে পেয়েছে। টুলুর কথা শুনে জয় আর টুপুলের বুক কেঁপে উঠলো।

পিডি কস্টা স্যার রহস্য হেসে বললেন, কে ফেল করেছে সে কথা এখন বলা যাবে না। একটু পরে হেডমাস্টার আসবেন। রেজাল্ট তাঁর মুখ থেকেই শুনবে।

ওপরের ক্লাসের রিপোর্ট কার্ড দেয়ার জন্য হেডমাস্টার নিজে আসেন। তার নিচের ক্লাসে যান এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার আর প্রাইমারি সেকশনে ক্লাস টিচাররাই রেজাল্ট বলেন।

ক্লাস টেন-এর দুই সেকশনের রেজাল্ট দিয়ে ওদের ক্লাসে আসতে হেডমাস্টার ব্রাদার মার্টিনের সাতাশ মিনিট সময় লাগলো। ততক্ষণে প্রাইমারি সেকশনের ছেলেরা রিপোর্ট কার্ড নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি চলে গেছে। ওপরের ক্লাসের জন্য ঘন্টা বাজবে হেডমাস্টার যখন বলবেন।

এক গোছা হালকা সবুজ রঙের রিপোর্ট কার্ড হাতে হন্তদন্ত হয়ে ব্রাদার মার্টিন ক্লাসে ঢুকতেই টুলু তড়াক করে দাঁড়িয়ে দ্রুত গলায় বললো, স্ট্যান্ড, সেলুট টু।

টুলুর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের সবাই দাঁড়ালো। ব্রাদার মার্টিন ইশারায় ওদের বসতে বললেন। পি ডি কস্টা স্যার ছাড়া সবাই বসলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। গাঙ্গুলি স্যারের কথায় পিন ড্রপ সাইলেন্স।

ব্রাদার মার্টিন ভূমিকা না করে রিপোর্ট কার্ডে নাম দেখে বললেন, এইবার তোমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হইয়াছে শাহেদ জামান। আগে থেকেই তৈরি ছিলো শাহেদ। উঠে গিয়ে ব্রাদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রিপোর্ট কার্ড নিলো। মৃদু হেসে নিচু গলায় ব্রাদার ওকে বললেন, কনগ্রাচুলেশন মাই বয়।

তিরিশ পর্যন্ত নাম ডাকার পরও যখন ওদের নাম ডাকা হলো না তখন জয় আর টুপুল রীতিমতো প্রমাদ গুনলো। বেশির ভাগ সময় ওদের রেজাল্ট দশ থেকে পনেরোর ভেতর থাকে। ক্লাস সেভেনের হাফ ইয়ার্লিতে একবার আঠারো আর কুড়িতে নেমেছিলো। বাড়িতে বকুনি আর পিটুনি খেয়ে ফাইনালে আবার দশ আর বারোতে উঠে গেছে।

একত্রিশ, বত্রিশ, ডেকে যাচ্ছেন ব্রাদার–ওদের নাম নেই। ক্লাস নাইনে সব মিলিয়ে চল্লিশ জন ছাত্র। তবে কি ওরা ফেল করেছে? টুপুল আর জয় দুজনই চোখে অন্ধকার দেখলো।

তেত্রিশে ব্রাদার ডাকলেন আমানুল্লার •ম, গতবার যে ফেল করে নাইনে উঠতে পারেনি। ওকে রিপোর্ট কার্ড দেয়ার সময় ব্রাদার মৃদু হেসে বললেন, তুমি যে পাশ করিয়াছ আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

আমানুল্লা মুখ লাল করে টুপুলের বাঁ পাশে বসতেই চৌত্রিশ নম্বরের ডাক এলো–জয়ন্ত কুমার সরকার। জয় কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেলো। ব্রাদার ওর কার্ডে চোখ বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি এত খারাপ করিয়াছ ক্যান?

জয় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্রাদার বললেন, আশা করি ক্লাস টেন-এ ভাল করিয়া পড়াশুনা করিবে। এসএসসিতে ফার্স্ট ডিভিশন পাইতে হইবে।

রিপোর্ট কার্ড হাতে করে জয় এসে টুপুলের ডান পাশে বসলো। টুপুল তাকিয়ে দেখলো, জয়ের চোখে পানি, ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপছে।

ছত্রিশে ডাকা হলো টুপুলের পোষাকি নাম—ইরফান হাবিব।

জয়কে ব্রাদার যে কথা বলেছিলেন শক্ত গলায় একই কথা ওকেও বললেন। শেষে আরও ভয়ঙ্কর এক কথা বললেন, তোমার বাবাকে বলিবে, আমার সঙ্গে যেন কাইল পরশুর মইধ্যে দেখা করেন।

পৌষের হাড়-কাঁপানো শীত ক্লাসে বসে টের পাওয়া গেলেও টুপুলের কপাল ঘেমে উঠলো। কান দুটো গরম হয়ে ভেতরে শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগলো। কোনো রকমে নিজের জায়গায় এসে বসার পর আর মাত্র দুজনের নাম শুনলো। ওদের ক্লাসের আটত্রিশ জন ক্লাস টেন-এ উঠেছে, দুজন ফেল করেছে।

ব্রাদার মার্টিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে যারা রেজাল্ট ভালো করেছে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে কি সব বললেন। শাহেদের রেজাল্ট নাকি অসম্ভব ভালো হয়েছে। কবিরও চেষ্টা করলে ম্যাট্রিকে প্লেস পাবে। টুপুল আর জয়ের কানে সেসব কিছুই ঢুকলো না। এমন কি পাঁচ মিনিট পর ছুটির ঘন্টা শুনে সবাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও ওরা ওদের জায়গায় চুপচাপ বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পর মস্ত এক চাবির গোছা হাতে মাঝবয়সী মোটাসোটা দপ্তরি হেনরি ক্লাস বন্ধ করতে এসে ওদের দুজনকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো। বুঝলো, পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। এ রকম হয়। সমবেদনার গলায় হেনরি ওদের বললো, তমাগোরে বুঝি ফেল করাইয়া দিছে। এইখানে আর বইসা থাইকা কি করবা, বাড়িত যাও। মন দিয়া ল্যাখাপড়া কর, সামনের বার পাশ করন লাগবো।

দপ্তরি হেনরিকে কোনো কথা না বলে ওরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলো। সারা স্কুল তখন খাঁ খাঁ করছে। ফুটবল মাঠে কয়েকটা কাক ছাড়া কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। ওরা আবার বকুল তলায় গিয়ে বসলো। দমকল অফিসের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘন্টা বাজলো। কা কা করে কাকগুলো উড়ে গেলে সারাটা স্কুলে নেমে এলো এক ভয়ঙ্কর নিরবতা।

বকুলতলার শানবাঁধানো চাতালে হলুদ রঙের কয়েকটা পাকা বকুল ফল পড়েছিলো। টুপুল ওর একটা মুখে ফেলে বললো, কি করবি কিছু ঠিক করলি?

জয় বললো, বললাম তো বাড়ি যাবো না।

তুই বাড়ি না গেলে আমিও বাড়ি যাবো না। রেজাল্ট দেখলে ভাইয়া পিঠের ওপর আস্ত বেত ভাঙবে।

তোর মতো মারলে তো ভালোই ছিলো। বাবা বলে দিয়েছে, পনেরোর ভেতরে যদি জায়গা না থাকে তাহলে যেন বাড়ি না ফিরি।

টুপুল মৃদু গলায় বললো, ও কথা সব বাবাই বলেন। তাই বলে তো সত্যি সত্যি তোকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন নি। তুই বুঝি বাবাকে চিনিস না? শুকনো গলায় জয় বললো, আজ পর্যন্ত বাবার কথার নড়চড় হতে কেউ দেখেনি।

টুপুল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, কোথায় যাবি কিছু ভেবেছিস?

তাই তো ভাবছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো জয়।

আত্মীয়স্বজন কারও বাড়িতে যাওয়া যাবে না।

পাগল! সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবে। এখানে যাওয়ার মতো কোনো বন্ধুর বাড়িও নেই।

আমাদের সেরকম বন্ধুই বা কোথায়!

কলকাতায় আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে। স্বপ্নর কথা বলি নি তোকে?

গত বছর বলেছিলি। এখনও কি তোরা চিঠি লিখিস?

আগের মতো নয়। মাসে একটা। অনেকবার আমাকে লিখেছিলো কলকাতা যেতে।

সে তো তুইই লিখেছিস ঢাকা আসতে। পেনফ্রেন্ডদের ওরকম লিখতে হয়।

গিয়ে যদি হাজির হই ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

তোকে না ফেরালেও আমি কোন মুখে যাবো?

জয়ের কথা শুনে টুপুল একটু চুপসে গেলো। গত বছর ইয়ং অবজার্ভারে ঠিকানা দেখে কলকাতার স্বপ্নকে চিঠি লিখেছিলো টুপুল। স্বপ্নর মতো ওরও শখ স্ট্যাম্প জমানো, বই পড়া, ছবি দেখা, বেড়ানো আর খেলাধুলা। ছবি দেখে ক্লাস এইটের স্বপ্নকে ওর দারুণ লেগেছিলো। স্বপ্নরও যে ওকে ভালো লেগেছে সেটা জানতেও দেরি হয়নি। তৃতীয় চিঠিতে স্বপ্ন ওকে কলকাতায় বেড়াতে যেতে বলেছে। ওর বাবা-মাও নাকি খুশি হবেন বাংলাদেশের টুপুলকে দেখতে পেলে। টুপুলের পাসপোর্ট নেই। টুপুলের বাবা বলেছেন, এসএসসি পাশ করার আগে একা কোথাও যেতে পারবে না। পরের চিঠিতে স্বপ্ন জানিয়েছে ওরও নাকি একই সমস্যা।

টুপুলকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জয় জানতে চাইলো–কি ভাবছিস?

কাষ্ঠ হেসে টুপুল বললো, কলকাতার স্বপ্নর কথা ভাবছি।

ওর কথা ভাবার কি হলো? ভারি গলায় জানতে চাইলো জয়।

ইন্ডিয়া যেতে হলে পাসপোর্ট ভিসা লাগবে। আমাদের কোনোটাই নেই।

অনেক টাকাও লাগবে। আমাদের তাও নেই।

টাকার কথা উঠতেই টুপুল বললো, তোর পকেটে কত টাকা আছে রে?

দশ টাকা। তোর?

পঞ্চাশ টাকা। পাশের বাড়ির ছোড়দির জন্য কি সব জরি কিনতে হবে। লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে।

তার মানে ওটা তোর টাকা নয়। খরচ করা যাবে না।

বাড়িই যদি না যাই জরি কিনে কাকে দেবো?

কোনোদিনই যাবি না?

শক্ত গলায় টুপুল বললো, তুই যদি আমার সঙ্গে থাকিস কোনোদিনই না।

কি করবো তাহলে?

একটু ভাবলো টুপুল। আট বছর আগে মা মরে যাবার পর ওর পাঁচ বছরের বড়ভাই ওকে শাসন করার ষোলআনা দায়িত্ব নিয়েছে। নিজে পড়াশোনায় ভালো বলে টুপুলকেও তার মতো হতে হবে। রেজাল্ট একটু খারাপ হলে এমনভাবে ওকে পেটায় যেন ও মানুষ নয়। বাবার কাছে ওর সাতখুন মাপ। মার খেয়ে অনেক সময় টুপুলের মনে হয়েছে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। এ বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। একা সাহসে কুলোয় নি বলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এতদিন কোথাও যায়নি। জয় ওর একমাত্র বন্ধু। ও যদি সঙ্গে থাকে টুপুল যেখানে খুশি যেতে পারে।

জয় আবার প্রশ্ন করলো, কিছু বলছিস না যে?

আমরা চট্রগ্রাম গিয়ে কোনো জাহাজে চাকরি নিতে পারি। কিছু পয়সা জমিয়ে একদিন এক অচেনা বন্দরে নেমে যাবো। নতুন নতুন দেশ দেখবো, নতুন মানুষ দেখবো। বলতে গিয়ে টুটুল উদাস হয়ে গেলো।

জয় বললো, জাহাজে আমাদের কিসের চাকরি দেবে? বিদ্যে তো মোটে ক্লাস নাইন।

আমরা যে কোনো কাজ করতে পারবো। দরকার হলে জাহাজের খালাসি হবো। আমাদের স্বাস্থ্য তো খারাপ নয়।

খেলাধুলোর কারণে টুপুল আর জয় দুজনের স্বাস্থ্যই রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। বড়দের মতো ওদের হাতের আর পায়ের মাসল। বুকের মাপ আটত্রিশ–ড্রিল টিচার বলেছেন দুবছরের মধ্যে বেয়াল্লিশ পেরিয়ে যাবে। ক্লাস টেনের রবিউল ছাড়া স্কুল। টিমে ওদের চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য আর কারও নয়।

টুপুলের কথা শুনে শুকনো হেসে জয় বললো, লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে শেষকালে জাহাজের খালাসিগিরি করে জীবন কাটাবো?

তা কেন? টুপুল বিব্রত গলায় বললো, সারা জীবন খালাসি থাকতে কে বলেছে! হাতে কিছু টাকা জমলে আমেরিকা চলে যাবো। টাকা থাকলে সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে কোনো অসুবিধে হবে না। দরকার হলে পালা করে পড়বো। কখনো আমি চাকরি করবো, তুই পড়বি। কখনো তুই চাকরি করবি, আমি পড়বো। তারপর একটা র‍্যাঞ্চ কিনে কাউবয় হয়ে যাবো।

ব্রাদার ফিলিক্স মাঝে মাঝে ওদের সিনেমা দেখান স্কুলের হলঘরে প্রোজেক্টর বসিয়ে। আগে ওদের মজা লাগতো কার্টুন ছবি। এখন ওরা কাউবয় ছবি দেখতে পেলে আর কিছু চায় না।

তোর কি মনে হয় ষাট টাকা দিয়ে আমরা দুজন চিটাগাং পর্যন্ত যেতে পারবো? জয়ের কথা শুনে টুপুল একটু দমে গেলো। চট্টগ্রাম যেতে ট্রেনে কত লাগে ওর জানা নেই। এটুকু শুধু জানে–ট্রেনের থার্ড ক্লাসের ভাড়া বাসের চেয়ে কম। ওদের ক্লাসের হিরুদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে। ছুটি হলেই ওরা বাড়িতে যায়। ট্রেনের গল্প হিরুদের কাছে অনেক শুনেছে। মা থাকতে টুপুলরা বার দুয়েক বরিশালে নানার বাড়ি গিয়েছিল। এ ছাড়া কখনও ঢাকার বাইরে যায় নি। জয়ের দৌড় বিক্রমপুর পর্যন্ত। ফি বছর পূজোর ছুটিতে ওরা সবাই বিক্রমপুরে যায়। সেখানে এখনও ওদের আদিবাড়িতে ঘটা করে দুর্গা পুজো হয়। কিছুক্ষণ ভেবে টুপুল বললো, কলতাবাজারের সাদেক ভাই আমাদের ক্লাবের জন্য কিছু চাঁদা দিতে চেয়েছিলো। চল গিয়ে দেখি টাকাটা এখন পাওয়া যায় কিনা।

জয় উঠে দাঁড়ালো। সামান্য হেসে বললো, ক্লাবের চাঁদাটাও এভাবে মেরে দিবি?

টুপুল গম্ভীর হয়ে বললো, মারবো কেন? প্রথম মাসের বেতন পেলে ঠিক পাঠিয়ে দেবো। ছোড়দির জরির টাকা সুদ্ধো।

ওদের স্কুল থেকে কলতাবাজারে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। সাদেক হোসেন কলতাবাজারের বনেদি পরিবারের ছেলে। পুরানো ঢাকায় ওদের গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে। বিয়ে থা করে নি। কাজকর্মও কিছু করে না। বাড়ি ভাড়ার যা টাকা পায় নাম কেনার জন্য অকাতরে চাদা দিয়ে বেড়ায়। খালি একবার পটাতে পারলেই হলো। ফুটবলের শখ আছে জেনে টুপুল দিন দশেক আগে ওদের ক্লাবের সেক্রেটারিকে নিয়ে এসে সাদেক হোসেনকে ভালোমতো পটিয়ে গিয়েছিলো।

ভরদুপুরে একজনের বাড়িতে এভাবে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা ভেবে ওরা একটু ইতস্তত করছিলো। দরজার কড়া নাড়তে ওদের বয়সী কাজের ছেলে এসে জানতে চাইলো, কারে চান?

টুপুল গম্ভীর গলায় বললো, সাদেক ভাই আছেন?

আছে। কি কমু?

বল কাগজিটোলা ক্লাবের টুপুল এসেছে।

বসেন। বলে ছেলেটা ভেতরে চলে গেলো।

একটু পরেই সাদেক হোসেন বেরিয়ে এলো। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। এরই ভেতর ছোটখাট একটা ভুঁড়ি গজিয়েছে। ফর্সা অমায়িক চেহারা। সোফায় বসে হেসে বললো, আরে তুমি? কোইথেইকা আইলা? তোমাগো কেলাবের খবর কি?

টুপুল একটু হেসে বললো, ক্লাবের খবর তো আপনি জানেনই। আমরা ঠিক করেছি আপনাকে আমাদের পেট্রন বানাবো।

একগাল হেসে সাদেক হোসেন বললো, পেট্রন-টেট্রন না বানাইলেও চান্দা দিমু কইছি, দিমু। ট্যাকা কি অখনই লাগবো?

ইতস্তত করে টুপুল বললো, আপনার যদি অসুবিধে না হয়–।

অসুবিধা কিয়ের? হেসে উড়িয়ে দিলো সাদেক–তোমরা কি বাড়ির থনে আইতাছ?

না, স্কুল থেকে।

তাইলে তো অখনো খাও নাইক্কা। আমি খাইবার বইছিলাম। লও, তোমরাও খাইবা।

খাওয়ার কথা শুনে ওদের খেয়াল হলো পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ছে। তবু জয় বিব্রত গলায় বললো, না না, আমরা বাড়ি গিয়ে খাবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

তুমি নতুন আইছ তো, শরম লাগতাছে। আমার এইহানে শরমের কিছু নাই। এই বলে সাদেক গলা তুলে ডাকলো, আরে অই বিলা, কই গেলি?

যে ছেলেটা ওদের দরজা খুলে দিয়েছিলো সে ঘরে ঢুকতেই সাদেক বললো, টেবিলে আরো দুইজনের খানা লাগা।

টুপুলরা আর আপত্তি করলো না। করলেও সাদেক শুনতো না। দুপুরবেলা ওদের বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে ফেরত যাবে এমন অদ্ভুত কথা সাদেক জীবনেও শোনে নি।

জয় আর টুপুলের খিদে যেমন পেয়েছিলো টেবিলে আয়োজনও ছিলো অনেক। বড় বড় কই মাছ ভাজা, রুই মাছ রান্না, মুরগির দোপেয়াজি–পেট ভরে খেলো ওরা। খাওয়ার পর দুশ টাকা চাঁদা নিয়ে যখন রাস্তায় নামলো, তখন আর ওদের মুখে হাসি ধরে না। যেন বিশ্ব জয় করেছে।

বেশিক্ষণ ওরা মুখের হাসি ধরে রাখতে পারলো না। কমলাপুর স্টেশনে এসে টিকেট কাটতে গিয়ে শুনলো দুজনের চট্টগ্রামের ভাড়া একশ আশি টাকা। শোনামাত্র ওদের মুখ শুকিয়ে গেলো। স্টেশনে আসার পথে ওরা দুশ টাকার বাজেট করে ফেলেছে। ওদের দুজনের বাড়তি প্যান্ট শার্ট কিনতে হবে। একটা ব্যাগও লাগবে। ভেবেছিলো একশ টাকায় দুজনের টিকেট হয়ে যাবে। জয় অসহায় গলায় বললো, এখন কি হবে?

টুপুল মরিয়া হয়ে জবাব দিলো, টিকেট ছাড়াই ট্রেনে উঠবো।

ধরতে পারলে জেলে পুরবে।

তাতে কি! বাড়ি তো যাচ্ছি না?

পুলিশ যদি বাড়িতে খবর দেয়?

বাড়ির ঠিকানা কে দিচ্ছে? ধরলে বলবো বরিশাল থেকে এসেছি। ব্যাগ স্যুটকেস হারিয়ে গেছে।

স্টেশনে লোকজনের ব্যস্ত পায়ে আনাগোনা দেখতে দেখতে ওরা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। প্ল্যাটফর্মে পর পর তিনটা ট্রেন দাঁড়ানো। তিনটাতেই লোক উঠছে। স্টেশনের একজন কুলিকে টুপুল জিজ্ঞেস করলো এর ভেতর কোটা চট্টগ্রাম যাবে।

কুলি মাঝখানের ট্রেনটা দেখিয়ে দিলো। দুপাশের তুলনায় মাঝখানেরটা একটু লক্করমার্কা। তবে নোকজনের ভিড় কম। পেছন দিকে প্রায় খালি একটা কামরা দেখে ওরা উঠে পড়লো।

কামরার এক কোণে দুজন বুড়ি গুটিসুটি মেরে বসে আছে। টুপুল চাপা গলায় জয়কে বললো, আমাদের মতো বিনা টিকেটের।

জয় বললো, চল ওপরের বাঙ্কে শুয়ে থাকি। প্যাসেঞ্জার কম দেখলে টিকেট চেকার নাও আসতে পারে।

সাদেক হোসেনের বাড়িতে ভরপেট খেয়ে টুপুলের মনে হচ্ছিলো লম্বা একটা ঘুম দেয়া দরকার। রেজাল্ট বেরোবার ভয়ে গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি।

ভালো বলেছিস। টুপুল হেসে বললো, এক ঘুমে চিটাগং চলে যাবো।

ওরা দু দিকের বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লো। বালিশ ছাড়া শুতে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো। তবে স্কাউটিং করার অভিজ্ঞতা থাকাতে এ নিয়ে ওরা মাথা ঘামালো না। কিছুক্ষণ পর চলন্ত ট্রেনের মৃদু দুলুনিতে মাথার নিচে হাত রেখে ওরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। রাতে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে আসার আগে পর্যন্ত টেরও পেলো না ওরা ভুল ট্রেনে চট্টগ্রামের উল্টো দিকে চলে গেছে।

.

০২.

টুপুলের বাবা বাংলাবাজারের এক বইয়ের দোকানে ম্যানেজারের চাকরি করেন। রাত নটার আগে কখনো তাঁর বাড়ি ফেরা হয়না। দোকান বন্ধ করতে করতে সাড়ে আটটা বেজে যায়। সেদিন আটটার সময় টুপুলের বড়ভাই হাবুল হন্তদন্ত হয়ে দোকানে এসে হাজির। ওদের বাবা তখন সারাদিনের বিক্রির হিসেব মেলাচ্ছিলেন। হাবুল উদ্বিগ্ন গলায় বললো, টুপুলকে আপনি কোথাও পাঠিয়েছেন বাবা?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, নাতো! কি হয়েছে?

এখনো ও বাড়ি ফেরে নি।

সে কি? ম্যাচ-ট্যাচ খেলতে কোথাও যায় নি তো?

না। ওর ক্লাসের ছেলেদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছি। স্কুলের দপ্তরি বললো, দুপুর পর্যন্ত নাকি জয়ের সঙ্গে স্কুলে ছিলো। বাড়িতে খেতেও আসেনি।

তাহলে যাবে কোথায়? তোর মেজো মামার বাসায় খবর নিয়েছিস?

মেজ মামা, ফুপু-সবার বাসায় খবর নিয়েছি। পাড়ার ক্লাবের ছেলেরাও খুঁজছে। কাল নাকি কোথায় ম্যাচ আছে।

জয়দের বাড়িতে কি বললো?

জয়ের বাবার খুব রাগ দেখলাম। জয়ও মনে হচ্ছে টুপুলের সঙ্গে আছে। বললেন, পরীক্ষার ফল বেরুতেই পাখা গজিয়েছে। দ্যাখো গে কোনো সিনেমা হলে নয়তো কোনো বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে।

হতেও পারে। চিন্তিত গলায় বললেন টুপুলের বাবা।

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললো, সন্ধ্যার পর টুপুল কোথাও গেলে দাদিকে বলে যায়। দুপুরে না খেলেও বলে। সিনেমা দেখতে হলেও দাদির কাছ থেকে পয়সা নিতো।

বন্ধুরা কেউ দেখাচ্ছে হয়তো। চল বাড়ি যাই। এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে।

অন্যদিন টুপুলের বাবা হেঁটে বাড়ি যান। হাঁটলে মিনিট পনেরো লাগে। সেদিন তিনি রিকশা নিলেন। রাস্তা ফাঁকা থাকাতে পাঁচ মিনিটেই বাড়ি পৌঁছে গেলেন।

কড়া নাড়তেই টুপুলের দাদি দরজা খুললে। টুপুলের আপন দাদি নন। বাবার দূর সম্পর্কের কাকি হন। সম্পর্ক কাছের না হলেও মা-মরা নাতি দুটোকে পাখির বাচ্চার মতো বুকে আগলে রাখেন। দরজা খুলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন, কি রে, ছোঁড়ার কোনো খবর পেলি?

হাবুল মাথা নাড়লো–না দাদি।

হতভাগা কোথায় গেলো! বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন দাদি–কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?

টুপুলের বাবা বললেন, কাঁদছো কেন কাকি? আমি এক্ষুণি হাসপাতালে খবর নিচ্ছি। হাবুল থানায় গিয়ে দ্যাখ। এ্যাকসিডেন্ট হলে থানাওয়ালারা বলতে পারবে।

টুপুলের দাদি এরই ভেতর পীরের দরগায় দশ টাকা সিন্নি মানত করেছেন। হাবুলরা চলে যেতেই তিনি দরজায় খিল দিয়ে জোড়া মোরগ মানত করে নফল নামাজ পড়তে বসলেন।

থানা আর হাসপাতাল ঘুরে টুপুলের বাবা আর ভাই সাড়ে দশটার দিকে ফিরলেন। খবর না পেয়ে টুপুলের দাদি হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন। হাবুল বললো, থানার লোকেরা খোঁজখবর নেয়া শুরু করেছে। তুমি ভেবো না দাদি। কালই টুপুলের খবর পেয়ে যাবো।

ভাইপো আর নাতিকে খেতে দিয়ে দাদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, আজ পাশের খবর বেরুবে শুনে ইলিশের ডিমের বড়া করলাম। ছেলেটা কদিন ধরে খেতে চাইছিলো।

বাবা বললেন, ওরটা রেখে দাও। কাল এসে খাবে।

হাবুল বললো, ওকে ভালোমতো শাসন করা দরকার। কিছু না বললে বেড়ে যাবে।

তোমার আর শাসনের দরকার নেই বাছা। দাদি শুকনো গলায় বললেন, ছেলে বড় হয়েছে। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়।

আমি ওর ভালোর জন্যেই শাসন করি।

হঠাৎ দাদির মনে হলো টুপুল ছেলেধরার পাল্লায় পড়েনি তো? কথাটা বলতে গিয়ে আবার তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন। টুপুলের বাবা মাথা নাড়লেন–না কাকি। এতবড় ছেলে ছেলেধরার হাতে পড়বে না।

বড় কোথায় দেখলি বাপ! সবে তো পনেরোতে পড়লো।

পনেরো হলেও দেখতে ওকে আঠারো-ঊনিশের মতো দেখায়। ওকে নিয়ে ছেলেধরাদের কোনো কাজ হবে না।

ছেলেধরা না হোক, গুণ্ডা-বদমাশের পাল্লায় তো পড়তে পারে। ধরে নিয়ে কোথাও হয়তো আটকে রেখেছে।

মনে হয় না। টুটুলের বাবার ততক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে। গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন, গুণ্ডারা ধরে তো টাকার জন্যে। ওরা খোঁজ খবর নিয়েই ধরে। ওদের নজর হচ্ছে বড়লোকদের ওপর। আমার মনে হচ্ছে ক্লাসের কারো হয়তো পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয়েছে। সবাই কোথাও বসে মজা করছে।

দাদি শুকনো গলায় বললেন, তাই যদি করে বুঝতে হবে ছেলে তোমার লায়েক হয়েছে। এতদিন আমাকে না বলে কোথাও যায় নি।

বাবা ভেবেছিলেন পরদিন সকালে টুপুল এসে যাবে। নটার সময় তিনি দোকানে যান। তখনও টুপুলকে ফিরতে না দেখে হাবুলকে বললেন, তুই একবার ওদের স্কুলে যা। হেডমাস্টার আর ক্লাস টিচারের কাছে খোঁজ নে। আমি ছুটি নিয়ে দুপুরে চলে আসবো।

দাদি বললেন, পুটির মা এলে আমি দুপুরের দিকে নারিন্দার হুজুরের কাছে যাবো।

দুটো নাগাদ টুপুলের বাবা বাড়ি ফিরলেন। দাদি আর হাবুল তার আগেই ফিরে এসেছিলো। টুপুলের বাবার কাছে কোনো খবর আসেনি শুনে তিনি আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন–টুপুল রে বলে।

তাঁর কান্না থামাবার জন্যে টুপুলের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, নারিন্দার হুজুর তোমাকে কি বললেন?

কি আর বলবেন, সবর করতে বলেছেন। পানিপড়া দিয়েছেন। তিনদিনের ভেতরে না ফিরলে আবার যেতে বলেছেন।

হুজুর যখন সবর করতে বলেছেন তখন আর কান্নাকাটি করো না। এই বলে টুপুলের বাবা একটু থামলেন। তারপর হাবুলকে বললেন, তুই বলছিস টুপুলের সঙ্গে জয়ও আছে?

তাই তো মনে হচ্ছে। ওদের দুজনকে স্কুলের দপ্তরি হেনরি বারোটা পর্যন্ত একসঙ্গে দেখেছিলো।

আরেকবার জয়দের বাড়ি গিয়ে দেখবি কোনো খোঁজ খবর এলো কি না?

আপনি যান। ওর বাবা ভীষণ বদমেজাজি।

ঠিক আছে। আমিই যাচ্ছি। বলে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়লেন টুপুলের বাবা।

হাবুলের মনে পড়লো সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নেয়া হলেও টুপুলদের ক্লাবে ও যায়নি। যদিও টুপুল গত কয়েকদিন যাবৎ ক্লাবে কম যাচ্ছে তবু গিয়ে একবার দেখা দরকার –এই ভেবে হাবুল গেলো কাগজিটোলা ক্লাবে।

জয়ের বাবা অক্ষয়কুমার সরকার জজকোর্টের পেশকার। অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর। কারো কোনো বেচাল দেখলে পিঠে বেত ভাঙেন। টুপুলের বাবার সঙ্গে মুখ-চেনা সম্পর্ক। সেদিন তিনি কোর্টে যাননি। বাইরের ঘরে বেতের চেয়ারে বসে খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন। টুপুলের বাবাকে দেখে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে নির্বিকার গলায় বললেন, জোড়মানিকের কোনো খোঁজ পেলেন?

টুপুলের বাবা শুকনো গলায় বললেন, না। থানা, হাসপাতাল, বন্ধুদের বাড়ি সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। ভাবলাম আপনারা কোনো খোঁজ পেলেন কি না!

আপনার মতো থানা পুলিশ করবার অতো সময় নেই আমার। গিন্নি তো সকাল থেকে শয্যা নিয়েছেন কুটোটি মুখে তুলছেন না। ওকে অনুমানেই বলেছি, আপনি সব জায়গায় গিয়েছিলেন। খোঁজ পেলে আসবেন।

জয়ের কোনো আত্মীয়বাড়ি নেই, যেখানে ওরা যেতে পারে?

আমার ধারণা বাছাধন পরীক্ষায় ফেল মেরেছে। বলেছি পনেরোর ভেতর থাকতে না পারলে যেন বাড়িমুখো না হয় । গিন্নির কান্নাকাটিতে বড় ছেলে বিক্রমপুর গেছে। খবর পেলে জানাবো। এই বলে জয়ের বাবা আবার দাঁত খোঁচাতে লাগলেন।

টুপুলের বাবা বাড়ি ফিরে দেখেন বসার ঘরে একজন তরুণ পুলিশ অফিসার বসে আছে। তিনি ঘরে ঢুকতে অফিসারটি উঠে দাঁড়ালো–আমি সূত্রাপুর থানা থেকে আসছি, এস আই নজরুল ইসলাম। আপনারা থানায় দুটি ছেলে সম্পর্কে মিসিং রিপোর্ট করেছেন?

টুপুলের বাবা ঢোক গিলে বললেন, হ্যাঁ, কোনো খোঁজ পেয়েছেন?

এস আই ইতস্তত করে বললেন, আজ সকালে আরিচা রোডে ভয়ানক এক বাস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ষোলজন মারা গেছে। এর ভেতর চৌদ্দ-পনেরো বছরের দুটি ছেলে আছে। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। কাপড়-চোপড় দেখে মনে হয় ভদ্র ফ্যামিলির। আইডেন্টিফাই করার জন্যে আপনাকে একবার হাসপাতালে আসতে হবে।

টুপুলের বাবা কোনো কথা বলতে পারলেন না। এস আই-এর সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পুলিশের জীপে উঠলেন। খবর পেয়ে পাড়ার মহিলারা এসেছেন। টুপুলের দাদির সঙ্গে দেখা করতে। হাবুল তখনও ক্লাব থেকে ফেরেনি।

হাসপাতালের মর্গে ঢুকে টুপুলের বাবা এমনই ভেঙে পড়লেন যে, এস আই এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, মন শক্ত করুন। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না।

দুর্ঘটনার খবর শোনার পর থেকেই টুপুলের বাবার মনে হচ্ছিলো মর্গে গিয়ে তাঁকে তার ছেলের লাশ সনাক্ত করতে হবে। ডোম যখন ঠাণ্ডা মর্গে খড়খড় করে লোহার দেরাজ টানছিলো, মনে হচ্ছিলো তার বুকের ওপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। শক্ত হাতে তিনি আঁকড়ে ধরলেন পুলিশ অফিসারকে।

মুখ ছাড়া শরীরের আর কোথাও জখমের কোনো দাগ নেই। মুখের বাঁ দিকটা উড়ে গেছে। ডান দিক অক্ষত। মনে হয় গভীর প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা। টুপুলের বাবার বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে

গেলো–আহা রে, কোন্ বাবা-মার কোল খালি করে এভাবে চলে গেলো! কথাটা মনে হতেই তাঁর দুচোখ বেয়ে টপটপ করে কান্না গড়িয়ে পড়লো।

পুলিশ অফিসার নজরুল ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলেনা–আপনার ছেলে?

না। ধরা গলায় ফিস ফিস করে বললেন টুপুলের বাবা, জোরে কথা বললে বুঝি ঘুম ভেঙে যাবে যাবে ছেলেটার আমার ছেলে নয়। মনে মনে বললেন, আমার মত হতভাগ্য কারো ছেলে।

টুপুলের বাবা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। তাঁর ভয় হলো টুপুল হয়তো অন্য কোনো শহরে অন্য কোনো হাসপাতালে এভাবে মর্গে পড়ে আছে। এস আই নজরুল তাঁকে জীপে বসিয়ে থানায় নিয়ে এলো।

সুত্রাপুর থানার মোটাসোটা ওসি নির্লিপ্ত গলায় টুপুলের বাবাকে বললেন, আপনি অযথা উতলা হচ্ছেন। আজকালকার ছেলেদের তো চেনেন। বাড়িঘর, বাপ-মা কিছুই কেয়ার করে না। দেখবেন দুদিন পর ঠিকই সুড়সুড় করে ঘরে এসে ঢুকছে।

টুপুলের বাবা ভাঙা গলায় বললেন, আমার ছেলে ওরকম নয়।

আপনার ছেলে অন্যরকম হতে পারে। বন্ধুবান্ধব তো আর ওর মতো নয়। নিশ্চয় কারো পাল্লায় পড়েছে।

আপনারা কি অন্য কোনো শহরের থানা বা হাসপাতালে খবর নিতে পারেন না?

ওসি গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন হাবিব সাহেব, এ ধরনের কেস-এ আটচল্লিশ ঘন্টার আগে মুভ করবার নিয়ম নেই। এ বয়সের ছেলেরাই বাড়ি থেকে পালায়।

আমি বলছিলাম, একটু ইতস্তত করে টুপুলের বাবা বললেন, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে! পালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট তো হতে পারে!

তা পারে। স্বীকার করলেন ওসি–আমি কাল অয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দেবো। কাল বিকেলে আপনি একবার দেখা করে যাবেন। কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে আপনার ছেলে ফিরে আসবে।

থানা থেকে বাড়ি ফিরে টুপুলের বাবা হাবুলের কাছ থেকে শুনলেন কলতাবাজারের সাদেকের কাছ থেকে টুপুল আর জয়ের টাকা নেয়ার ঘটনা। কাগজিটোলা ক্লাবে সাদেকের সঙ্গে হাবুলের দেখা হয়েছিলো। ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়ে হাবুল বললো, শয়তান দুটো প্ল্যান করে পালিয়েছে। আসুক এবার, মজা টের পাওয়াবো।

টুপুলের দাদি এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিলেন। হাবুলের শেষের কথায় তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, দ্যাখ ছোঁড়া, কালও তুই এরকম কথা বলেছিলি। লেখাপড়া সবার সমান হয় না। নিজে সারাক্ষণ বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকিস। পাড়াপড়শির কোনো বিপদ হলে তোকে ত্রিসীমানায় দেখা যায় না। টুপুল আর জয় সবার আগে গিয়ে দাঁড়ায়। সকাল থেকে পাড়ার বউ-ঝিরা এসে ওদের অনেক কথা বলে গেলো। আমি নিজেও ছাই এতসব জানতাম না। তোকে বাছা শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি কোনোদিন তোকে টুপুলের গায়ে হাত তুলতে দেখি তাহলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

দাদির ধমক খেয়ে হাবুল মুখ কালো করে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। টুপুলের বাবারও মনে হলো, লেখাপড়ায় বড় ছেলের মতো মাথা পরিষ্কার নয় বলে ছোট ছেলেকে তিনি যথেষ্ট অবহেলা করেছেন। আজ সকালে ওর ঘরে গিয়ে প্রথম বারের মতো ওঁর চোখে পড়েছে দেয়াল-আলমারির তাক ভর্তি ছোট-বড় নানা সাইজের কাপ। লাল ফিতে বাঁধা মেডেলও রয়েছে কয়েকটা। এতসব টুপুল কখন পেয়েছে। তিনি জানেনও না। হয়তো লেখাপড়ায় ভালো হাবুলের ওপর ওঁর পক্ষপাত দেখে টুপুল অভিমান করে কখনও ওঁকে এসব দেখায়নি। টুপুলকে সাত বছরের রেখে ওর মা মারা গেছেন। বাবা ভাবলেন, মা মরা ছোট ছেলেটার ওপর তিনি অনেক অবিচার করেছেন। বছর দুয়েক আগে একটা ফুটবল চেয়েছিলো বলে তিনি টুপুলের কান মলে দিয়ে বলেছিলেন, পরীক্ষায় তো দশের ভেতর নাম দেখি না, সারাদিন খেলা নিয়ে পড়ে থাকলে বড় হয়ে কুলিগিরি করে খেতে হবে। এসব কথা ভাবতে গিয়ে টেরও পেলেন না কখন তাঁর দুচোখে পানি জমেছে।

টুপুলের বাবা পরদিনও অফিসে গেলেন না। হাবুলকে দিয়ে মালিককে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনদিনের ছুটি চেয়ে। সকালে জয়ের বাবাকে গিয়ে বলে এসেছেন সাদেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওরা কোথাও গেছে। জয়ের বাবা আগের মতোই নির্বিকার যেখানেই যাক, দিনের পর দিন বসিয়ে খাওয়াবে এমন কোন কুটুম্ব কোথাও নেই । দেখবেন হাতের টাকা ফুরোলেই ফিরে আসবে।

বিকেলে থানায় যাওয়ার জন্যে যখন টুপুলের বাবা বেরোতে যাবেন তখনই মোটর সাইকেলে এস আই নজরুল এসে হাজির। ব্যগ্র হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন খবর শোনার জন্যে। এস আই তাকে হতাশ করলেনা। এখনও কোন খবর পাইনি। বোঝেনই তো, বন্ধু-বান্ধব কারো বাড়িতে থাকলে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

এস আই-কে ভেতরে এনে বসালেন টুপুলের বাবা। বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম ওর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, তাহলে বন্ধুর বাড়িতে আছে জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।

অ্যাকসিডেন্টের খবর থাকলে কাল সকালের ভেতর পেয়ে যাবো। এস আই একটু গম্ভীর হয়ে বললো, ইদানীং ওকে কি আপনারা অচেনা বা নতুন কোনো লোকজনের সঙ্গে মিশতে দেখেছেন?

টুপুলের বাবা বিব্রত গলায় বললেন, আমি সারাদিন দোকানে থাকি, ছেলেরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে ঠিক বলতে পারবো না। তবে ওর বড়ভাই আর দাদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা দুজনেই না বললো। আসলে ফুটবল খেলা ছাড়া টুপুল আর জয়ের অন্য কোনো শখ নেই।

এস আই আগের মত গম্ভীর গলায় বললো, এ বয়সী ছেলেদের স্মাগলাররা অনেক সময় ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে দলে ভেড়াতে চায়, টাকার লোভে অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেও স্বেচ্ছায় এ লাইনে আসে।

টুপুলের বাবা বললেন, আমরা অবস্থাপন্ন নই এটা সত্যি কথা, তবে আমার ছেলেরা টাকার জন্য যে কুপথে যাবে না–এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমি তো বলিনি সবাই স্বেচ্ছায় যায়, কেউ কেউ যায়। অনেকে যেতে বাধ্য হয়।

বাধ্য কেন হবে?

বিশেষ কারণে হয়তো বেশ কিছু টাকার দরকার হলো। জানে বাড়িতে চাইলে পাবে না। কিংবা কোনো ছেলের এমন কোনো দুর্বলতার কথা ওরা জেনে ফেললো। তখন এ নিয়ে ব্ল্যাকমেলও করে।

টুপুলের বাবা পুলিশের যুক্তির কাছে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তবু অসহায় গলায় বললেন, নজরুল সাহেব, নিজের ছেলে বলে বলছি না। পাড়ার লোকদের জিজ্ঞেস করুন। টুপুল খুবই ভালো ছেলে।

নিজের জন্যে না হোক, পরোপকারী ছেলে যখন, অন্য কারো টাকার দরকারেও তো ওদের সঙ্গে জুটে যেতে পারে। না না, এমনটা হয়েছে আমি বলছি না। শুধু সম্ভাবনাগুলো যাচাই করে দেখছি।

যদি তাই হয় আমরা কি করতে পারি?

আপনি আগামী কাল খবরের কাগজে ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিন। লিখে দিন ওর দাদি মৃত্যুশয্যায়। সেই সঙ্গে সন্ধানদাতার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করতে পারেন। তাহলে লুকিয়ে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

এস আই নজরুলের শেষে কথাটা টুপুলের বাবার পছন্দ হলো। বললেন, আমি গরিব মানুষ। তবু বলছি, কেউ যদি টুপুলকে এনে দিতে পারে আমি দশ হাজার টাকা দেবো তাকে।

এস আই হেসে বললেন, তাহলে ধরে নিন বিজ্ঞাপন বেরোনোর তিনদিনের ভেতর আপনার ছেলে ফিরে এসেছে।

টুপুলের দাদি নারিন্দার হুজুরের কাছে গিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকতেই এস আই-এর কথাগুলো ওঁর কানে এলো। বললেন, বাছা তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ক।

টুপুলের বাবাও কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হলে কোনো অবস্থায় টুপুল নিজেকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁরা তখন কেউ অনুমানও করতে পারলেন না টুপুলরা কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে।

৩-৪. চট্টগ্রামের উল্টো দিকের ট্রেনে

মাঝরাতে টুপুল আর জয় যখন শুনলো ভুলে তারা চট্টগ্রামের উল্টো দিকের ট্রেনে চেপে জগন্নাথগঞ্জ এসে পড়েছে তখন তারা কিছুক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে গেলো। ট্রেনের কামরায় যাত্রী বেশি ছিলো না। সবার শেষে এক বুড়ো ভদ্রলোক নামলেন বগলে বেডিং আর টিনের স্যুটকেস হাতে। নামার সময় তিনি একগাল হেসে বললেন, তোমরা কি ফেরি পার হবে? মেল ট্রেন এসে গেলে স্টিমারে বসার জায়গা পাবে না। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন টুপুলরা স্টিমারে যমুনা পার হয়ে সিরাজগঞ্জ যাবে।

বুড়ো নেমে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর যাত্রীদের কোলাহল যখন মিলিয়ে গেলো টুপুল জয়কে জিজ্ঞেস করলো, এখন কি করবি?

জয় বললো, যশোরে আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছে। ওদের বাড়ি গিয়ে কদিন থাকা যায়।

আমাদের না চিটাগাং যাওয়ার কথা! জাহাজে চাকরি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরবো!

বাড়ি যাবো না ঠিক করেছি যখন তখন চিটাগাং যশোর দুই-ই আমার কাছে সমান। তাছাড়া তুই চিটাগাং গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাবি তার কোন ঠিক আছে?

তোর বোন যদি বাড়িতে খবর দেয়?

বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি যেতে দশ-বারো দিন লাগে। তাছাড়া ওদের বলার দরকার কি যে আমরা পালিয়ে এসেছি! বলবো পরীক্ষা শেষ, বেড়াতে বেরিয়েছি। গত বার যাবার সময় জামাইবাবু বারবার বলেছে যেতে।

বেড়াতে যাবো এভাবে ছন্নছাড়ার মতো?

সিরাজগঞ্জ গিয়ে দুটো প্যান্ট শার্ট আর বাকি সব জিনিস কিনে নেবো। বাজেট তো করাই আছে?

ভাগ্যিস পথে কোন টিকেট চেকার এ কামরায় আসেনি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো টুপুল।

চল তাহলে, স্টিমারে গিয়ে জায়গা নিতে হবে।

ট্রেনের কামরায় জানালা-দরজা সব বন্ধ ছিলো বলে ওরা পৌষের শীতের দাপট টের পায়নি। চারদিক ফকা নির্জন স্টেশনে নামতেই ঠাণ্ডা বাতাস ওদের হাড়ে কামড় বসালো। ঢাকার কুয়াশায়র চেয়ে অনেক বেশি শীত উত্তরের এসব এলাকায়। ওদের দুজনের গায়েই উলের পুরো হাতার সোয়েটার ছিলো। পরনে গরম প্যান্ট আর পায়ে জুতো-মুজোও ছিলো। তবু ওদের মনে হলো ওভারকোট কিংবা মোটা উলের চাদর ছাড়া এ শীত কাবু করা যাবে না।

কিছুদূর হেঁটে স্টিমার ঘাটে এসে মনে হলো শীতের দাপট যেন আরও বেড়েছে। লোকজন লোমওয়ালা বানরটুপি আর হাতমুজো পরে মোটা চাদর আর কম্বলে গা মুড়ে স্টিমারের ডেক-এ বসে আছে। ঘাটের কুলিরা পর্যন্ত তিন-চারটা জামা আর সোয়েটার পরেছে। আগে স্টিমারে চড়ার অভিজ্ঞতা থাকার কারণে টুপুল বললো, ওপরে বসা যাবে না। নিচে ইঞ্জিনঘরের কাছে গিয়ে বসলে শীত কম লাগবে।

জয় কোনো কথা না বলে টুপুলকে অনুসরণ করলো। ডেকের ওপর যাত্রী বেশি ছিলো না। ওরা ভেবেছিলো নিচের তলা বুঝি ফাঁকা পাবে। ভেতরে ঢুকে স্টিমারের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত এক চক্কর দিয়েও বসার জায়গা পেলো না। কোথাও লোকজনের ভিড় তেমন নেই। তবে এক একজন লেপ কম্বল বিছিয়ে তিন-চারজনের জায়গা দখল করে শুয়ে-বসে থাকার জন্য জায়গার অভাব দেখা দিয়েছিলো ।

জয় কাষ্ঠ হেসে বললো, মনে হচ্ছে ডেকে বসে বাকি রাত শীতের কামড় খেয়ে কাটাতে হবে।

টুপুল বললো, কাউকে বলে দেখি বসার জায়গা দেয় কি না।

কাকে বলবি? বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে।

ইঞ্জিনের পাশে এক ভদ্রলোক মনে হলো একা আছেন।

বললে যদি খেঁকিয়ে ওঠে? এমনিতে সঙ্গে টিকেট নেই।

চেহারা দেখে তো ভালোই মনে হলো। চল না বলে দেখি।

টুপুলের পেছন পেছন জয় আবার এগিয়ে গেলো ইঞ্জিনের দিকে। মনে মনে প্রার্থনা করলো, লোকটা যেন রাজি হয়। ডেকে বসে বিনা কম্বলে রাত কাটাতে হলে নির্ঘাত মারা পড়বে।

ভদ্রলোকের বয়স তিরিশের কোটায়। গায়ের রঙ ফর্সা, ধারালো বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মনে হয় কোন বিদেশি কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ, যাকে স্টিমারের কেবিনে ভালো মানাতো। টুপুল বিনয়ের সঙ্গে

বললো, স্যার আমরা কোথাও বসার জায়গা পাচ্ছি না। দয়া করে যদি আপনার বিছানাটা একটু সরাতেন–আমরা বসতে পারতাম।

ভদ্রলোক একটা নোটবইতে কি যেন লিখছিলেন। টুপুলের কথা শুনে চোখ তুলে তাকালেন। দুটি নিষ্পাপ মুখ, পেটানো শরীর, মনে হয় স্পোর্টসম্যান–দেখে ওর ভালো লেগে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চিন্তাও ঝলসে উঠলো। হেসে বললো, বিছানা সরাতে হবে কেন, ওপরেই বসো। তুমি বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো?

নরম কম্বলের বিছানায় ভদ্রলোকের দুপাশে বসে টুপুল আর জয় বিনয়ে বিগলিত হলো–অবশ্যই আমাদের তুমি বলবেন। বয়সে স্যার আমরা আপনার অনেক ছোট।

নরম হেসে ভদ্রলোক বললো, আমি খুশি হবো আমাকে স্যার না ডেকে যদি নাজমুল ভাই বলো। আমার নাম নাজমুল আবেদিন খান। এই বলে হাত বাড়িয়ে দিলো।

টুপুল প্রথমে নিজের নাম বলে হাত মিলিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি।

জয়ও নিজের নাম বলে সদ্য-পাওয়া নাজমুল ভাই-র সঙ্গে হাত মেলালো।

তোমরা কি ঢাকা থেকে আসছো?

টুপুল আর জয় মাথা নেড়ে সায় জানালো। নাজমুল আবার প্রশ্ন করলো, কোথায় থাকো তোমরা?

এবার ক্লাস টেন-এ উঠেছি।

কোন স্কুল? কেউ পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বলবে না এটা টুপুলরা আগেই ঠিক করে নিয়েছিলো। কিন্তু নাজমুল আবেদিনকে প্রথম দেখাতেই ওদের এত ভালো লেগে গিয়েছিলো যে স্কুলের আসল নামটা বলে ফেললো। ভদ্রলোকের গলায় নির্দোষ কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

ওদের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মিষ্টি হেসে নাজমুল বললো, তোমরা যে জয়ের বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছো নিশ্চয় তোমাদের বাড়ির কেউ জানে না!

টুপুল আর জয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো, ঢোক গিলে টুপুল বললো, আপনি কিভাবে বুঝলেন?

তোমাদের সঙ্গে কোন লাগেজ না দেখে অনুমান করেছি।

কিছুক্ষণের জন্য ওরা হতভম্ব হয়ে গেলো। নাজমুলের মিটিমিটি হাসি দেখে মনে হচ্ছে সে ওদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে। জয় চাপা গলায় বললো, আপনি কি গোয়েন্দার কাজ করেন নাজমুল ভাই?

হা-হা করে গলা খুলে হাসলো নাজমুল আবেদিন–আরে না, গোয়েন্দাগিরি করবো কেন? আমি ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করি।

কারো সঙ্গে লাগেজ না থাকলে ধরেই নিতে হবে। সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে? জানতে চাইলো টুপুল।

না, না, লাগেজ না থাকলেই তাকে বাড়ি-পালানো বলতে যাবো কেন? তোমরা ঢাকা থেকে যশোর যাচ্ছো বোনের শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে ব্যাগ-স্যুটকেস নেই–কুটুম্ববাড়িতে কেউ নিশ্চয় একবস্ত্রে বেড়াতে যায় না!

তার মানে ব্যাগ-স্যুটকেস থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন না আমরা বাড়ি থেকে পালিয়েছি কি না।

তা পারতাম না। তবে ব্যাগ-সুটকেস গুছিয়ে বেরোবার সময় বাড়ির লোকজন নিশ্চয় জানতে পারতো। তখন আর সেটাকে পালানো বলা যেতো না।

জয় করুণ গলায় বললো, আপনি নিশ্চয় আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবেন না নাজমুল ভাই? আমরা বাড়ি থেকে পালালেও সত্যি বলছি দিদির বাড়িতেই যাচ্ছি।

টুপুল যোগ করলোআমাদের সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা আছে। সিরাজগঞ্জে নেমে শার্ট প্যান্ট আর একটা ব্যাগ কিনে নেবো।

নাজমুল মিষ্টি হেসে বললো, তোমরা যদি আমাকে বন্ধু ভেবে থাকো তাহলে নিশ্চয় পুলিশে খবর দেবো না।

বিস্ময় আর আনন্দে অভিভূত হয়ে টুপুল বললো, আপনার মত বন্ধু পাওয়া মস্ত বড় ভাগ্যের ব্যাপার!

জয় বললো, আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

নাজমুল দুহাতে জয় আর টুপুলকে কাছে টেনে বললে, এখন থেকে আমরা বন্ধু। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবো না। এবার বলো, বাড়ি থেকে পালিয়েছো কেন?

পরীক্ষার ফল বেরোনো থেকে শুরু করে সারাদিন যা যা ঘটেছে সব কথা নাজমুলকে খুলে বললো টুপুল।

সহানুভূতির গলায় নাজমুল বললো, তোমরা যে বাড়ি থেকে পালিয়েছে বাড়িতে মা কান্নাকাটি করবেন না?

টুপুল ম্লান হেসে বললো, আমার মা থাকলে তো কাদবেন। লেখাপড়ায় ভালো নই বলে ভাইয়া যখন তখন মারে। বাবাও ওকে কিছু বলে না। ভাইয়া বলে আমি নাকি বংশের কলঙ্ক।

তোমারও কি মা নেই। আমাদের এগারো ভাই-বোন। বাবার কথার ওপর কারো কথা বলার সাধ্য নেই। বাবা বলেছেন, পরীক্ষার পনেরোর ভেতর না থাকলে যেন কখনও বাড়িমুখো না হই।

ওটা রাগের কথা। সত্যি সত্যি এমন কথা কোনো বাবা বলতে পারেন না।

আমার বাবা পারেন। তিনি যা বলেন তাই করেন।

পাশের জানালা দিয়ে নদী থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস উঠে এসে ওদের গায়ে কাঁপন ধরিয়ে বয়ে গেলো। নাজমুলের গায়ে পর্যাপ্ত গরম কাপড় থাকার জন্য নিজে টের না পেলেও ওদের কাঁপুনি অনুভব করলো । উঠে বেঞ্চের তলা থেকে বড় একটা স্যুটকেস টেনে নিয়ে তালা খুলে ভেতর থেকে একটা কম্বল বের করে বললো, তোমরা এটা গায়ে জড়িয়ে বসো, শীত লাগবে না।

টুপুল বিব্রত গলায় বললো, এখানে আর তেমন শীত কই?

স্টিমার ছাড়লে টের পাবে শীত কাকে বলে।

জয় বললো, আপনার শীত লাগবে না?

আমার গায়ে যে কোট দেখছো এটা ইউরোপের শীতকেও বুড়ো আঙুল দেখায়।

একটু ইতস্তত করে টুপুল বললো, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি খুব বড়লোক। আপনি কেবিনে না গিয়ে সবার সঙ্গে সেকেন্ড ক্লাসে কেন যাচ্ছেন?

মৃদু হেসে নাজমুল বললো, খুব বড়লোক না হলেও আমাকে অবস্থাপন্ন বলতে পারো। তবে টাকা থাকলেই দেখাতে হবে–এটাকে আমি বলি ছোটলোকিপনা। আমার পছন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে চুপচাপ বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা।

আপনি অদ্ভুত মানুষ নাজমুল ভাই।

ভালো অর্থে, না খারাপ অর্থে?

অবশ্যই ভালো অর্থে। আপনি কেবিনে গেলে কি আর আপনার ধারে-কাছে ভিড়তে পারতাম!

নাজমুল গলা খুলে হাসলো–তাহলেই দেখ সেকেন্ড ক্লাসে থাকাতেই তোমাদের মত চমৎকার দুটো বন্ধু পেয়ে গেলাম।

নাজমুলের আন্তরিকতায় জয় আর টুপুল একেবারে গলে গেলো। অল্প সময়ে মানুষকে আপন করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে নাজমুলের। কাছে বসতে দিয়ে হেসে দুটো কথা বলে, একটুখানি কম্বলের উষ্ণতা দিয়ে ওদের যেন কিনে ফেলেছে সামান্য পরিচয়ের প্রায়-অচেনা এই মানুষটি।

হাতের ঘড়ি দেখে নাজমুল বললো, রাত দেড়টা বাজে। তোমাদের ঘুম পাচ্ছে না?

ট্রেনে লম্বা ঘুম দিয়েছি। টুপুল বললো, আপনি কি ঘুমোবেন।

মিষ্টি হেসে নাজমুল বললো, আমার ভালো লাগছে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে।

জয় বললো, তাহলে আপনার নিজের কথা বলুন নাজমুল ভাই।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে নাজমুল বললো, তোমাদের দুজনকে আমার ভালো লেগেছে কেন জানো?

কেন? একসঙ্গে জানতে চাইলো টুপুল আর জয়।

আমিও তোমাদের মতো ঘর-পালানো ছেলে। নাজমুলের ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি।

সব কথা শুনতে চাই নাজমুল ভাই।

শুরু থেকে বলতে হবে কেন, কখন, কিভাবে পালালেন?

শোনো তাহলে। কোটের ভেতরের পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরালো নাজমুল। লম্বা এক টান দিয়ে একগাল ধোয়া ছেড়ে বললো, আমি পালিয়েছি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে।

কেন পালালেন?

পরীক্ষা দেয়ার পরই বুঝে গিয়েছিলাম পাশ করতে পারবো না। চিটাগাং-এ বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে মায়ের কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জয়দের মতো আমাদের পরিবারও কম বড় ছিলো না। আমরা আট ভাইবোন আমি সবার ছোট। মা বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে থাকতেন। বাবাও ব্যস্ত থাকতেন ব্যবসার কাজে। বখে যাওয়ার সব রকম সুযোগই ছিলো আমার। যে জন্য রেজাল্ট খারাপ হয়েছিলো। ইন্টারমিডিয়েট দেয়ার পর মনে হলো বাপের অনেক টাকা উড়িয়েছি। এবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেখি কিছু করতে পারি কি না। টুপুলের মতো আমার বড় ভাইরাও আমাকে বলতো ফ্যামিলির ব্ল্যাকশিপ, বংশের কলঙ্ক। কাউকেই আমি কেয়ার করতাম না। সেজো ভাইটা একবার একটা চড় মেরেছিলো। আমিও পাল্টা মেরেছি। তারপর থেকে আমার গায়ে হাত তোলার সাহস কারো হয়নি।

নাজমুলের কথা শুনে টুপুল ভাবলো, ও মিছেমিছি হাবুলের মার খাচ্ছে। গায়ের জোরে এখন আর হাবুল ওর সঙ্গে পারবে না। এবার থেকে মারের জবাব দিতে হবে।

একটু থেমে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে রিং-এর মত গোল করে ধোয়া ছেড়ে নাজমুল বললো, চিটাগাং গিয়ে এক ক্লিয়ারিং এজেন্টের ওখানে কেরানীর চাকরি নিলাম। মাস ছয়েক পর এক ইটালিয়ান জাহাজের বুড়ো ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ে গেলাম। চেহারাটা নেহাৎ খারাপ ছিলো না। তাছাড়া স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার জন্যে ইংরেজিও ভালো বলতে পারতাম। ক্যাপ্টেন জাভাত্তিনি বললো আমার

মতো নাকি ওর একটা ছেলে ছিলো। মাফিয়ারা মেরে ফেলেছে। আমাকে ওর জাহাজে চাকরি অফার করলো। শোনামাত্র আমি লুফে নিলাম। এরপর আট বছর ধরে জাভাত্তিনির সঙ্গে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরেছি। জাভাত্তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতো। ছ বছর না পেরোতেই আমাকে সেকেন্ড অফিসর বানিয়ে দিয়েছিলো। আট বছরের মাথায় জাহাজেই মারা গেলো জাভাত্তিনি। আমি ওর কামরায় ঘুমোতাম। হঠাৎ মাঝরাতে উঠে বললো, ডাক্তার ডাকো, বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। ছুটে গেলাম ডাক্তারের কাছে। এসে দেখি সব শেষ। জাভাত্তিনির শেষ। ইচ্ছামতো সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হলো ওর লাশ। তারপর আর জাহাজের চাকরি ভালো লাগলো না। সব ছেড়ে দেশে ফিরে এলাম।

বাড়ির সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেননি? জানতে চাইলো টুপুল।

জাহাজে চাকরি নেয়ার পর মার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ রেখেছিলাম। দুবছরের মাথায় বাবা মারা গেলেন। তার আটমাস পর মা। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছি দেড়মাস পর। তারপর থেকে বাড়ির সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখিনি। জাহাজের চাকড়ি ছাড়লেও সমুদ্র আমাকে সব সময় ডাকে। এখনও সময় পেলেই জাহাজে উঠে বসি। পুরোনো বন্দরে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

জয় প্রশ্ন করলো, আপনি বিয়ে করেননি?

না। মৃদু হেসে নাজমুল বললো, ঘর সংসার করা আমার স্বভাবে নেই। সমুদ্র যাদের ডাকে তারা কখনো সংসারী হতে পারে না।

ডিসেম্বরের শীতের গভীর রাতে যমুনার বুকে স্টিমারে বসে সদ্য পরিচিত এই সুদর্শন মানুষটি টুপুল আর জয়ের সামনে নানা রঙে বোনা এক স্বপ্নের জগতের অবিশ্বাস্য ছবি মেলে ধরলো। ওরা দুজনই ওদের রক্তের ভেতর অনুভব করলো সমুদ্রেক ডাক। মনে হলো ওরা যমুনা নদীর তীরে বাঁধা কোনো স্টিমারে নয়, গভীর আটলান্টিকের বুক চিরে ভেসে যাওয়া কোনো জাহাজে বসে আছে আলো-ঝলমলে বন্দরের অপেক্ষায়।

দুই কিশোরের নিষ্পাপ চোখে মুগ্ধ বিস্ময় নাজমুলও লক্ষ্য করলো। নরম গলায় বললো, তোমরা কি সত্যিই জাহাজে কাজ পেতে চাও?

জাহাজ আমাদের স্বপ্ন নাজমুল ভাই। ফিসফিস করে বললো টুপুল।

কতদিন আমরা গল্প করেছি অচেনা সব বন্দরে ঘোরার। জয়ের গলায় চাপা উত্তেজনা।

নাজমুল মৃদু হাসলো–ঠিক আছে, তোমাদের আমি জাহাজে চাকরি জোগাড় করে দেবো। তবে সময় লাগবে।

কতদিন? ব্যস্ত গলায় জানতে চাইলো টুপুল।

ধরো ছ-সাত মাস।

এ কদিন আমরা কোথায় পালিয়ে থাকবো?

আমার কাছে থাকবে। না, না কোনো দয়া দেখাচ্ছি না। তোমরা চিটাগাং আমার ফার্মে কাজ করবে। পরে এটা তোমাদের অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগবে। একটু থেমে নাজমুল বললো, আর কোন কথা নয়, রাত তিনটা বাজে। এখন ঘুম। বাকি কথা কাল হবে।

০৪.

পরদিন বিকেলে রাজশাহী সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে টুপুল আর জয় আরেক নাজমুল আবেদিনের সঙ্গে পরিচিত হলো। সিরাজগঞ্জ থেকে ওরা দুপুরে এসে পৌঁছেছে রাজশাহী। সার্কিট হাউসে ওঠার আগে নাজমুল ওদের নিয়ে গেছে সাহেব বাজারে। ওদের পছন্দ মতো দুটো করে জিন্স-এর প্যান্ট, শার্ট, জ্যাকেট আর যা কিছু দরকার সব কিনে দিয়েছে। এমনকি দুটো ব্যাগ পর্যন্ত। আড়াইটার সময় ওরা ক্লান্ত ট্যুরিস্ট-এর মতো সার্কিট হাউসে এসে উঠেছে।

নাজমুল যে একজন গণ্যমান্য কেউ-এখানে এসেই ওরা টের পেয়ে গেলো। আগে থেকেই ঘর বুক করা ছিলো। ওদের জন্য আরেকটা ঘর নেয়া হলো। দারোয়ান, আর্দালি সবাই চেনে ওকে। টেবিলে খানা লাগাতে বলে টেলিফোনে রাজশাহীর ডিসির সঙ্গে কথা বললো। মনে হলো ডিসি তার পুরানো বন্ধু। কথা শেষ করে টুপুলদের কৌতূহলের জবাব দিলো হাসান আর আমি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। ও এবছরই ডিসি হয়ে রাজশাহী এসেছে। ওর বাড়িতে উঠিনি দেখে মন খারাপ করেছে। একা থাকলে যেতাম, তোমরা সঙ্গে–এটাই ভালো।

টুপুল বিব্রত গলায় বললো, আমাদের জন্য আপনার বন্ধুর মন খারাপ হলো!

আরে না। কারো বাড়িতে ওঠা এমনিতেই আমার ভালো লাগে না। সেই পুরোনো কথা–এখনো বিয়ে করেনি কেন, হাতে ভালো মেয়ে আছে-এসব শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগে। বাড়ির বাইরে এখানে কেমন স্বাধীন মনে হচ্ছে না! যা ইচ্ছে করো, কেউ কিছু মনে করবে না।

নাজমুলকে ওরা দুজন যত দেখছিল ততই মুগ্ধ হচ্ছিলো। পৃথিবীতে এত ভালো লোক কি থাকতে পারে! দুপুরে খাবার টেবিলে নাজমুল নিজ হাতে ওদের প্লেটে এক টুকরোর বদলে দুটুকরো রুই মাছের পেটি তুলে দিলো, মুরগির মাংসও তাই। ওদের কোনো কথা শুনলো না। বললো, জানি তো পয়সা বাঁচাবার জন্য কাল রাতে তোমরা কিছুই খাওনি।

জয় বিগলিত গলায় বললো, আপনার দেখা না পেলে আজ দুপুরেও আধপেটা খেয়ে থাকতে হতো।

টুপুল বললো, আপনি আমাদের জন্য এত করছেন অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না।

নাজমুল কিছুটা আহত হলো-তোমরা এভাবে বলছো কেন? আমরা না বন্ধু! বন্ধুর জন্য বন্ধু করবে না তো আর কে করবে?

না, আমি বলছিলাম শুধু আপনিই করে যাচ্ছেন।

ঠিক আছে, যখন তোমাদের করার সুযোগ হবে তখন করবে।

খাওয়া শেষ করে নিজেদের ঘরে এসে টুপুল বললো, নাজমুল ভাই-র মত একজন বন্ধুর জন্য জানও দেয়া যায়।

ঠিক বলেছিস। ওর সঙ্গে একমত হলো জয়।

বিকেলে চা খেতে খেতে নাজমুল বললো, আমি তোমাদের একটা প্রস্তাব দিতে চাই। ভেবে দেখতে পারো গ্রহণ করবে কি না।

কি প্রস্তাব নাজমুল ভাই? জানতে চাইলো জয়।

একশবার গ্রহণ করবো। জানার আগেই রায় দিলো টুপুল।

একটু ইতস্তত করে নাজমুল বললো, তোমাদের কি বিপ্লবীদের গোপন রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?

আপনি কি নকশালদের কথা বলছেন? টুপুলদের ক্লাসের রনি ওর এক চাচার কথা বলেছিলো, নাকি নকশাল ছিলো। গোপন রাজনৈতিক দল করতো। পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে। নকশালদের কথা রনির কাছ থেকে ওরা প্রথম জেনেছিলো।

টুপুলের মুখে নকশাল শব্দটা শুনে নাজমুল অবাক হলো–ওদের কথা তুমি কিভাবে জানো?

রনির চাচার কথা শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। দেশকে ভালোবাসলে ওদের মতো জীবন দিতেও জানতে হয়।

জয় প্রশ্ন করলো, আপনিও কি নকশাল নাজমুল ভাই?

আমি সরাসরি ওদের সঙ্গে যুক্ত নই। তবে বিপ্লবীদের সাহায্য করি। যদিও ওদের ভেতর অনেক দল।

কিভাবে সাহায্য করেন?

ওদের টাকা দিয়ে সাহায্য করি। কখনো অস্ত্রও জোগাড় করে দিতে হয়।

অস্ত্র কেন?

অস্ত্র দিয়ে ওরা দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তো পুলিশ আর আর্মি আছে।

আমাদের মতো দেশে পুলিশ আর আর্মি কখনো সাধারণ মানুষের বন্ধু নয়। তোমরা কি জানো না আমাদের দেশের মানুষ এত গরিব কেন?

ক্লাসে বাংলার নলিনী স্যার একদিন যেভাবে বলেছিলেন টুপুল সেভাবে বললো, আমাদের দেশটা ছোট, মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। মানুষ বেশি বলে ফসল যা হয় তা দিয়ে সবার হয় না। আমাদের দেশের মানুষরা বেশি পরিশ্রমও করতে চায় না, বেশির ভাগই অলস। তাছাড়া আমাদের দেশে তেমন কোনো খনিজ সম্পদ নেই যা বিক্রি করে আমরা ধনী হতে পারি।

টুপুলের কথা শুনে নাজমুল যেন একটু বিরক্ত হলো-তোমাদের মিশনারি স্কুলগুলোতে এভাবেই উল্টোপাল্টা শিক্ষা দেয়া হয়। শোন, পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও কিছু লোক বেশি ধনী বলে, বেশির ভাগ সম্পদ নিজেদের দখলে রেখেছে বলে অন্যরা বঞ্চিত হয়ে গরিব হয়েছে। ধনীরা নানাভাবে গরিবদের শোষণ করে। কলে কারখানায় মালিকরা মজুরদের শোষণ করে, গ্রামে জোতদার মহাজনরা কৃষকদের শোষণ করে। আমাদের কৃষক-শ্রমিকরা কম পরিশ্রম করে না। কিন্তু তারা কখনো পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি পায় না। দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ এভাবে শোষিত হচ্ছে। শোষণ যারা করছে তারা দশভাগেরও কম। দুঃখের বিষয় দেশের সরকার, থানা, পুলিশ, আর্মি সব এই লুটেরা শোষকদের দলে। এরাই দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আপনি তাহলে বলছেন এদের মেরে ফেললে মানুষ আর গরিব থাকবে না?

ঠিক ধরেছো। ওদের মেরে ফেলতে পারলে দেশে সৎলোকের শাসন কায়েম হবে।

নকশালরা তাহলে দেশের মানুষের ভালোর জন্যে কাজ করছে?

চায়ে চমুক দিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো নাজমুল।

আমরাও কি ওদের জন্য কাজ করবো?

তোমরা যদি দেশকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসো তাহলে আমি বলবো তোমাদেরও উচিত ওদের সাহায্য করা।

কিভাবে সাহায্য করবো?

নানাভাবে করতে পারো। তবে এ কাজে অনেক বিপদ। পুলিশ ওদের হন্যে হয়ে খুঁজছে। যদি পুলিশ টের পায় ওদের সঙ্গে তোমাদের কোনোরকম যোগাযোগ আছে। তাহলে তোমাদেরও মেরে ফেলবে।

আপনি আমাদের জন্য এত কিছু করেছেন, আমরা আপনার জন্য এতটুকু বিপদ মাথায় নিতে পারবো না?

জয়ের কথায় মিষ্টি হাসলো নাজমুল-কাজটা আমার নয়, দেশের। এতক্ষণে প্রমাণ হলো তোমরা সত্যিকারের বন্ধু। দেশকে তোমরা সত্যিই ভালোবাসো।

আমাদের কি করতে হবে? কিছু করার জন্য তর সইছিলো না টুপুল আর জয়ের।

নাজমুল কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, তোমরা আপাতত চিঠি আনা–নেয়ার কাজ করতে পারো।

এটা আর এমন কি কাজ! একটু হতাশ হলো টুপুল।

বিপদের যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। একটা প্যাকেট আর চিঠি কলকাতার এক কমরেডকে পৌঁছে দিতে হবে। পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে যাওয়া চলবে না। যেতে হবে গোপন পথে, যাতে বর্ডারের পুলিশ বিডিআর কেউ টের না পায়।

টুপুল উত্তেজিত হয়ে বললো, কাল আমরা কলকাতা যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম।

আগে কখনো গিয়েছো?

না, তবে আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে।

পেনফ্রেন্ড লাগবে না। থাকার ব্যবস্থা ওরাই করবে। চিঠির জবাবের জন্য তিন চারদিন কলতায় থাকতে হতে পারে।

কবে যেতে হবে বলুন?

হয়তো কাল। সন্ধ্যের পর আমার কাছে একজন আসবে। তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবো কখন কিভাবে যাবে।

দারুণ লাগছে। গদগদ হয়ে বললো জয়।

নাজমুল ওদের দুজনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলো। মনে হলো তার নির্বাচন ভুল হয় নি। একটু গম্ভীর হয়ে বললো, তোমাদের একটা কথা বলবো, সব সময় মনে রাখবে। যাদের জন্য কাজ করছি তাদের দল গোপন। সমস্ত কাজকর্ম গোপনে করতে হয়। কেউ ঘুণাক্ষরেও যেন কিছু জানতে না পারে। কারো সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবে না। আর কোনো ব্যাপারে বেশি কৌতূহল দেখাবে না। তোমাদের যতটুকু বলা হবে ততটুকু করবে। যতটুকু জানানো হবে তার বেশি জানার চেষ্টা কোরো না।
নাজমুলের কথা শুনে টুপুলরা রোমাঞ্চিত হলো। পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার দুঃখ মন থেকে কর্পূরের মত উড়ে গেলো। মনে হলো দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছে ওরা, যা এতকাল শুধুমাত্র বড়দের বলে মনে হতো।
শীতের বিকেল অল্প কিছুক্ষণের ভেতর ফুরিয়ে গেলো। পাঁচটা না বাজতেই সার্কিট হাউসের সবুজ লনে কে যেন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিলো। নাজমুল বললেন, আমার কাছে যে লোক আসবে তাকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। তোমরা বরং এক কাজ কর। আসার সময় সাহেব বাজারের অলকা সিনেমায় দেখেছি গান্স অব নাভারন চলছে। যুদ্ধের ছবি, দেখে এসো, ভালো লাগবে।
টুপুল-জয়ের মুখে হাসি ধরে না। সার্কিট হাউজের বুড়ো আর্দালি জোনাবালিকে ডেকে নাজমুল বললো আমার ভাই দুটোকে অলকা হলে নিয়ে গিয়ে দুটো ব্যালকনির টিকেট কিনে বসিয়ে দিয়ে এসো।
টুপুল বললো, জোনাবালি কেন, আমরা ওকে ছাড়াই যেতে পারবো।
নাজমুল বললো, জানি পারবে। এখন জোনাবালি যাক। ফেরার সময় থাকবে না।
টুপুল আর জয় চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ সার্কিট হাউসের বারান্দায় একা বসেছিল নাজমুল। বুকের ভেতর একটু খচ খচ করছিলো–দুটো নিষ্পাপ ছেলেকে এরকম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া কি উচিৎ হচ্ছে? ওদের পুরোনো ছেলেটি কদিন আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। ঢাকা থেকে আসার পথে নাজমুল ইচ্ছে করেই ট্রেনে–স্টিমারে সেকেন্ড ক্লাসে বসেছে যদি পছন্দমতো কাউকে চোখে পড়ে। আগের ছেলেটাকেও সে এভাবেই পেয়েছিলো। আগেরটার বাপ-মা কেউ নেই, সত্মার অত্যাচারে বাড়ি ছেড়েছে। এদের তো সবই আছে।
এসব কথা ভাবতে গিয়ে একসময় নিজের ওপরই বিরক্ত হলো নাজমুল। এত বছর ধরে ভয়ঙ্কর সব বিপদজনক কাজের ভেতর থাকার পরও ধরনের ভাবালুতা ওকে মানায় না। ছেলে দুটোর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়ার জন্য ঘরে গিয়ে নিজের ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করলো।

টুপুলদের সিনেমা হলে বসিয়ে জোনাবালি ততক্ষণে ফিরে এসেছে। নাজমুল ওকে বললো, তিনটা গ্লাস, পানির বোতল আর বরফ দিয়ে যেতে।

এসব কাজে জোনাবালি খুবই দক্ষ। বললো, স্যার পটেটো ফ্রাই করে দেবো?

নাজমুল তখনও টুপুলদের কথা ভাবছিলো। নির্লিপ্ত গলায় বললো, দিতে পারো।

জোনাবালি গ্লাস, বরফ আর পানির বোতল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নাজমুলের দুজন মেহমান এলো। একজন মাঝবয়েসী, একটু মোটা, গায়ের রং কালো, ভারিক্কি চেহারা যেন কোনো স্কুলের বদরাগী হেডমাস্টার। আরেকজন কমবয়সী পায়জামা পাঞ্জাবী পরা, গায়ে চাদর, ফর্সা, রোগা দেখতে, গালে চাপদাড়ি, চোখে চশমা, মনে হয় কবি-সাহিত্যিক জাতীয় কিছু। নাজমুল ততক্ষণে গ্লাসে হুইস্কি ঢালা শুরু করেছে। চেয়ারে বসেই স্বাভাবিক গলায় ওদের বললো, এসো, আক্কাস, সাজ্জাদ, নতুন কোনো ঝামেলা হয় নি তো?

মাঝবয়সীর নাম সাজ্জাদ। সামনের চেয়ারে বসে ভারি গলায় বললো, না বস, সব ঠিক আছে।

নিজের গ্লাসে পানি আর বরফ মেশাতে মেশাতে নাজমুল বললো, আক্কাস, নিজেদেরটা ঢেলে নাও। আমাদের বৈঠক নটার ভেতর শেষ করতে হবে।

রোগা আক্কাস মিহি গলায় বললো, কেন বস, আর কেউ আসবে নাকি?

গ্লাসে চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় জানালো নাজমুল–পথে আসার সময় দুটো ভালো শিকার পেয়েছি। টোপ গিলেছে, আমার সঙ্গেই আছে।

সঙ্গে আছে শুনে সাজ্জাদ সতর্ক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। চাপা গলায় জানতে চাইলো–কোথায় বস?

তোমাদের সঙ্গে যেন দেখা না হয় সে জন্যে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছি।

আক্কাস সাবধানী গলায় বললো, সিনেমার টিকেট না পেয়ে একটু পরে এসে আবার হাজির হবে না তো?

না। নাজমুল হুইস্কির গ্লাসে আরেক চুমুক দিয়ে বললো, জোনাবালিকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম। টিকেট কেটে, হলে ঢুকিয়ে তারপর এসেছে।

কেমন শিকার বস? জানতে চাইলো সাজ্জাদ, চালাক চতুর আছে তো? বিশ্বাস করা যাবে?

খাঁটি মাল। ভালোভাবে যাচাই করেছি। বাড়ি থেকে পালিয়েছে, পুলিশে ধরা পড়ার ভয় আছে। আবার জাহাজে চাকরি করার লোভও আছে। আমার গল্প শুনে মুগ্ধ। ভালো গিলেছে দেশপ্রেমের টোপটা। দেশসেবার জন্য মুখিয়ে আছে।

নাজমুলের কথা শুনে ওর সঙ্গীরা নিরবে হাসলো। জোনাবালি এসে এক প্লেট আলু ভাজা দিয়ে গেলো। সাজ্জাদ বললো, ইউনিভার্সিটিতে মৈত্রী ইউনিয়ন আর লীগের ছেলেরা ঝামেলা বাধাচ্ছে। আমাদের দুটো ছেলেকে হল থেকে বের করে দিয়েছে।

আক্কাস আলু ভাজা চিবোতে চিবোতে বললো,চিটাগাং থেকে যে আমাদের সাথীদের আসার কথা ছিলো এখনও তো এলো না। এখানে গুলির দাম বেড়ে গেছে।

চিটাগাং-এর প্রায় ডবল।

গুলি–ফুলির দরকার কি? শান্ত গলায় নাজমুল বললো, যেগুলো বাড়াবাড়ি করছে ধরে হাত আর পায়ের রগ কেটে দাও। চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

চিটাগাং-এর সাথীরা এলেই ভার্সিটিতে অপারেশন শুরু হবে।

প্ল্যানে যেন গতবারের মতো কোনো খুঁত না থাকে। গম্ভীর গলায় সঙ্গীদের মনে করিয়ে দিলো নাজমুল–অপারেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু-একটা ছেলেকে সাবধানে স্ট্যাব করবে। তারপর ওদের সবকটাকে আসামী বানিয়ে থানায় কেস দেবে। মৈত্রীর হারামিটাকে এক নম্বর আসামী বানাবে।

মাথা নেড়ে সায় জানালো সাজ্জাদ আর আক্কাস। নিজের গ্লাস খালি হওয়ার পর নাজমুল ধীরে সুস্থে আরেক গ্লাস হুইস্কি তৈরি করলো। লম্বা চুমুক দিয়ে সাজ্জাদকে প্রশ্ন করলো, থানাওয়ালাদের পেমেন্ট ঠিক মতো করা হচ্ছে তো?

সাজ্জাদ সায় জানালো–এসব নিয়ে আপনি পেরেশান হবেন না। আমাদের সমস্ত পেমেন্ট সাত তারিখের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যায়।

নওগাঁতে যে দুটো নতুন ইউনিট করার কথা ছিলো, হয়েছে?

আক্কাস মিহি গলায় জবাব দিলো–একটা হয়েছে।

নাজমুলের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়লো–একটা কেন?

ওখানে বস নকশালরা খুব উৎপাত করছে। আত্রাইতে ঢোকাই যাচ্ছে না।

এ্যাদ্দিন পর নকশাল কোত্থেকে এলো?

আগে থেকেই ছিলো বস। মহা হারামি। সব কটার কাছে আর্মস আছে।

আমাদের সামনে যাওয়ার দরকার নেই। ওদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দাও।

পুলিশ ওদের ভয় পায় বস।

টাকা ঢালো গর্দভ। টাকা দিয়ে কাজ হাসিল না হলে ভয় দেখাও। টাকার লোভ আর জানের ভয় দুটোই পুলিশের লোকদের বেশি থাকে।

ঠিক আছে বস।

কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে কি যেন ভাবলো নাজমুল। ওর গ্লাস খালি হওয়ার পর সাজ্জাদ আবার ভরে দিলো । নাজমুল যখন চুপচাপ থাকে সাজ্জাদ আর আক্কাস তখন ভয়ে তটস্থ থাকে। দলের সবাই বলে নাজমুলের কম্পিউটার ব্রেন। শত্রুপক্ষ এক চাল দিলে ও পরের দশ চাল ভেবে রাখে। প্রতিপক্ষ কিভাবে এগোলে ও কিভাবে এগোবে এসব ওর নখদর্পণে। নইলে এত অল্প বয়সে ও দলের হাই কমান্ডের এতখানি গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারতো ন।

ওদের দলের দুটো ভাগ আছে। একভাগ প্রকাশ্যে থাকে, মিটিং-মিছিল করে, নির্বাচনে দাঁড়ায়, সংসদে গিয়ে বসে, কাগজে বিবৃতি দেয়, ছবি ছাপে। আরেক ভাগ নিজেদের একেবারে গোপন রাখে। যাদের সঙ্গে নিত্য চলাফেরা, ওঠাবসা তারাও জানে না ওদের আসল পরিচয়। দলের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ আর আনা-নেয়া করা, যাবতীয় গোপন ব্যবসা চালানো, গোপন কর্মীদের আধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া, কোথাও বোমা মেরে বা প্রতিপক্ষের কাউকে হত্যা করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া–এ সবই হচ্ছে দলের গোপন অংশের কাজ। দলের এই গোপন শাখার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হচ্ছে নাজমুল। প্রধান যে সে নামেই প্রধান, সত্তরের কাছে বয়স, মুক্তিযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবী হত্যা করার কারণে তাকে প্রধান করা হয়েছে। আজকাল চোখে ভালো দেখে না, বাত-ব্যামো লেগেই আছে, যে জন্য নাজমুল দুনম্বর হলেও সবাই জানে। শিগগিরই এক নম্বর হয়ে যাবে। ওর পছন্দ-অপছন্দের ওপর কর্মীদের অনেক কিছু নির্ভর করে।

তৃতীয়বার গ্লাস খালি করতে করতে নাজমুল ছক কেটে ফেলেছে টুপুল আর জয়ের অপারেশন কিভাবে সফল হবে। এ চালানে তিন কেজি হেরোইন যাবে ওপারে। নাজমুল নিজে পরখ করে দেখেছে–একেবারে খাঁটি মাল। ওদের নিজেদের কোম্পানির কাঁচামালের বাক্সে এসেছে ম্যাকাও থেকে। এ চালানে কম করে হলেও দুকোটি টাকা পাওয়া যাবে। টুপুলরা শুধু হেরোইনটুকু ঠিকানা মত

পৌঁছে দেবে। দাম হুন্ডি করে পাঠানো হবে। ইন্ডিয়ান মাড়োয়ারিরা কারবারে লেনদেনের ব্যাপারে কখনও নয়–ছয় করে না। শুধু সময় মতো মালটা ওদের হাতে তুলে দিতে পারলে হয় ।

অনেকক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়ে নাজমুল বললো, ছেলে দুটো সাহসী, চেহারা সুন্দর, খুবই ইনোসেন্ট–যা আমাদের কাজের জন্য জরুরি। গতবারের ছেলেটার চেহারায় একটা পাকামো ভাব ছিলো। একটু নার্ভাস টাইপের সেজন্য বিডিআরের ইনফর্মার সন্দেহ করেছিল। এদের ব্যাপারে সে রকম কিছু হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। কাসেদ আলী ওদের সঙ্গে যাবে, আক্কাস দূর থেকে নজর রাখবে, বর্ডারে ওদের নিবারণের হাওলা করে তবে ফিরবে। কাসেদ আলী ওদের কলকাতার ঠিকানায় তুলে দিয়ে আসবে। বার দুই-তিন যাওয়া-আসা করলে ওরা নিজেরাই যেতে পারবে।

সাজ্জাদ বললো, বস বলছিলেন ছেলে দুটো বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এর মধ্যে খবরের কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যায় নি তো?

এত শিগগির কেউ কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় না। নিশ্চিন্ত গলায় জবাব দিলো নাজমুল –তাছাড়া ওরা কাল রাতেই বর্ডার পার হচ্ছে।

নাজমুল যখন টুপুলদের নিয়ে এসব ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছিলো তখন ওরা সিনেমায় ছারপোকার কামড় ভুলে রুদ্ধশ্বাসে নাভারনের জার্মানদের কামান অকেজো করে দেয়ার দুঃসাহসিক অভিযান দেখছিলো। যদি জানতো ছবির গ্রেগরী পেকদের চেয়ে বড় বিপদে ওরা নিজেরা পড়তে যাচ্ছে তাহলে এই মুহূর্তেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতো।

৫-৬. নাশতার টেবিলে

সকাল নটায় নাশতার টেবিলে মিষ্টি হেসে নাজমুল টুপুলদের সম্ভাষণ জানালো–সুপ্রভাত বন্ধুরা, রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

লাজুক হেসে টুপুল বললো, দারুণ ঘুম হয়েছে।

জয় বললো, আগের রাতেরটুকু পুষিয়ে নিয়েছি।

তাহলে শুরু করা যাক। আমি এক ঘন্টা ধরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

সরি নাজমুল ভাই! বিব্রত গলায় টুপুল বললো, বাড়িতে কখনও এত দেরিতে উঠি না।

বন্ধুকে কখনও সরি বলতে হয় না টুপুল! নাজমুল অভিমান ভরা গলায় বললো, আমার সঙ্গে কি তোমাদের ভদ্রতার সম্পর্ক যে সরি বলবে?

টুপুল তাড়াতাড়ি–সরি আর বলবো না, বলেই সঙ্গে সঙ্গে এতটুকু জিভ কাটলো।

ওর কথা শুনে জয় আর নাজমুল হো হো করে হেসে উঠলো। টুপুল ওদের সঙ্গে হাসতে গিয়ে বিষম খেলো।

টেবিল ভরা নাশতা সাজিয়েছে জোনাবালি। ঘিয়ে ভাজা পরোটা, ফুলকপি আলু, ভাজি, মুরগির দোপেয়াজি, ডবল ডিমের অমলেট, ছানা, কলা, আপেল সবকিছু পরিপাটি করে সাজানো। টুপুল বললো, জীবনে এমন রাজকীয় ব্রেকফাস্ট করিনি।

নাজমুল কোনো কথা না বলে মৃদু হাসলো। জয় বললো, নাজমুল ভাইকে দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে আজ।

টুপুলও প্রশংসার চোখে তাকালো। ভোরে উঠে শেভ করেছে নাজমুল। ফরসা মসৃণ গালে হালকা সবুজ আভা, নাম-না-জানা আফটার শেভ লোশনের মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে, গায়ে রাজশাহী সিল্কের নকশাতোলা পাঞ্জাবির ওপর সুন্দর কাজ করা চমৎকার কাশ্মিরী শাল। টুপুল বললো, এত সুন্দর শাল আমি জীবনেও দেখি নি।

জয় বললো, নিশ্চয় খুব দামী শাল?

মৃদু হেসে নাজমুল বললো, হ্যাঁ, শালটা একটু দামী। ইন্ডিয়ান টাকায় তিরিশ হাজার পড়েছিলো। তাও চার বছর আগে কেনা। এখন বোধহয় আরও বেড়েছে।

এত দাম! আঁতকে উঠলো টুপুল।

কাশ্মীর থেকে কিনেছিলাম। এটাকে ওরা বলে পশমিনা। কাশ্মীরের একেবারে উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের এক কোণে লেহ বলে একটা জায়গা আছে। সেখানেই শুধু পাওয়া যায় দুর্লভ জাতের এই ভেড়া, যাদের নোম দিয়ে পশমিনা তৈরি হয়।

আপনি খুব সৌখিন মানুষ। প্রশংসাভরা গলায় বললো জয়।

বিব্রত হয়ে নাজমুল বললো, শুধু পোশাকের ব্যাপারে সৌখিন বলতে পারো।

খাওয়ার ব্যাপারেও। হেসে যোগ করলো টুপুল।

মোটেই না। নাজমুল প্রতিবাদ জানালো-জোনাবালিকে জিজ্ঞেস করো, একা যখন থাকি তখন দুখানা বাটার টোস্ট আর একটা আপেল নয়তো কলা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারি।

তাহলে এত সব কেন?

মৃদু হেসে নাজমুল বললো, সবই আমার সদ্য পাওয়া মিষ্টি দুই বন্ধুর জন্য।

টুপুল আর জয় লজ্জায় লাল হয়ে দ্রুত নাশতা সারলো। চায়ের পর্ব শেষ করে নাজমুল বললো, তোমরা দুপুরের পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ রওনা হচ্ছে। রাতে বর্ডার ক্রস করবে। সঙ্গে অবশ্য লোক থাকবে, কোনো অসুবিধে হবে না।

টুপুল কাল রাত থেকে যে কথাটা বলার জন্য উশখুশ করছিলো সেটা বলে ফেললো–নাজমুল ভাই, যাওয়ার আগে দুটো মানিঅর্ডার করতে চাই ঢাকায়। আপনাকে তো বলেছি ছোড়দির জরি কেনার টাকা আর ক্লাবের চাঁদা নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম চাকরি পেলে প্রথম মাসের বেতন থেকে পাঠিয়ে দেবো।

নাজমুল ব্যস্ত হয়ে বললে, নিশ্চয় পাঠাবে। তোমরা কোনো চিন্তা কোরো না। ঠিকানা দিয়ে দাও। বিকেলে আমার লোক আসবে। আজই টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার করে দেবো। তোমরা বাড়িতে দুটো চিঠিও দিতে পারো–ভালো আছো লিখে। বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা তাহলে কমবে।

গত রাতে সাজ্জাদের কথা উড়িয়ে দিলেও নাজমুল পরে ভেবেছে, খবরের কাগজে যদি টুপুল-জয়ের ছবিওয়ালা হারানো বিজ্ঞপ্তি বের হয় আর সঙ্গে যদি পুরস্কার ঘোষণার কথা থাকে, পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাবলিকও কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে। ওদের চিঠি পেলে নিশ্চয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি বেরোবে না।

বাড়িতে চিঠি লেখার আইডিয়া টুপুলদেরও ভালো লাগলো। টুপুল দাদিকে আর জয় মাকে চিঠি দিয়ে জানালো ওরা ভালো আছে। এক সঙ্গে আছে। ওদের জন্য যেন কেউ চিন্তা না করে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই ওরা বাড়ি ফিরবে যাতে অযথা পড়ে পড়ে

কারো মার কিংবা বকুনি খেতে না হয়।

জোনাবালি পোস্ট অফিস থেকে খাম কিনে আনলো। টুপুল আর জয় খামের ওপর ঠিকানা লেখার পর নাজমুল বাঁ দিকের কোনায় ইংরেজিতে এক্সপ্রেস ডেলিভারি লিখে দিলো, বললো, আরএমএস-এ দিলে নাকি কালই পেয়ে যাবে। জোনাবালিকে দিয়েই চিঠি দুটো আরএমএস-এ পোস্ট করার জন্য পাঠানো হলো।

রাজশাহীতে খবরের কাগজ একদিন পরে যায়। আগের দিনের বাসি কাগজে চোখ বুলিয়ে নাজমুল টুপুলদের বললো, তোমরা কি তাস খেলা জানো?

টুপুল আর জয় একে অপরের দিকে তাকালো। ওরা জানে তার বড়রা খেলে, কেউ ওদের শেখায় নি। দুজনই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো। নাজমুল বললো, এসো তোমাদের ব্রিজ খেলা শিখিয়ে দিই।

নাজমুলকে ওরা যত দেখছিলো ততই মুগ্ধ হচ্ছিলো। ওদের সঙ্গে ওর ব্যবহার সত্যিকারের বন্ধুর মতোই, ছোট-বড়র কোনো ব্যবধান নেই। তখন পর্যন্ত শুধু সিগারেটটা অফার করেনি। করলে অবশ্য ওরা খেতো না।

নজমল স্যুটকেস থেকে দারুণ সুন্দর নকশা করা তাসের প্যাকেট বের করলো। কিভাবে ডাকতে হয়, নম্বর কিভাবে গুনতে হয়–ব্রিজ খেলার সবকিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়ে নাজমুল গেম সাজিয়ে বসলো। খেলতে খেলতে টুপুল আর জয় ভাবলো, বাড়ি থেকে পালানোর দুদিনের ভেতর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের, যেন ওদের বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেছে। ওদের ক্লাসের ছেলেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না আজ রাতে কি দুঃসাহসিক অভিযানে নামতে যাচ্ছে ওরা। বিনা পাসপোর্ট ভিসায় গভীর রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীদের গোপন কাগজপত্র নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার কথা ওরা যতবার ভাবছিলো ততবারই রোমাঞ্চিত হচ্ছিলো।

খেলার ফাঁকে টুপুল নাজমুলকে জিজ্ঞেস করলো, যখন আমরা কলকাতা থাকবো সে কদিন কি বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে পারবো?

নিশ্চয়ই পারবে। মিষ্টি হেসে নাজমুল বললো, প্রতুলকে আমি চিঠিতে লিখে দেবো। তোমাদের যেন কলকাতায় যা যা দেখার আছে সব দেখিয়ে দেয়।

জয় অভিভূত হয়ে বললো, দারুণ হবে!

কিছু যদি কিনতে ইচ্ছে করে কোনো লজ্জা করবে না। প্রতুল আমার বিজনেস পার্টনার। যা বলতে তাই কিনে দেবে।

যা বলবে তাই! বিস্ময়ে টুপুলের চোখ কপালে উঠলো।

যা বলবে তাই। লোকে বলে টাকা দিলে কলকাতায় নাকি বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

বাঘের দুধ কিনে আমরা কি করবো? নিরীহ গলায় জানতে চাইলো জয়।

টুপুল হেসে বললো, খেয়ে দেখলে মন্দ হয় না!

কেন, বাঘের মত ডাকার জন্য? চার পায়ে হাঁটার জন্য?

তাহলে তোমাদের সুন্দর বনের ভেতর দিয়ে বর্ডার ক্রস করতে হবে। দুই বন্ধুর রসিকতায় নাজমুলও হেসে ফেললো।

দুপুরে খাওয়ার পরই ওদের রওনা হতে হলো। থুতনিতে একটুখানি ছাগুলে দাড়ি, মাথায় আধময়লা কিস্তি টুপি, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী, তার ওপর বহু পুরোনো কালো একটা কোট গায়ে, কালো পামশু আর লাল নায়লনের মুজো পায়ে শুকনো লিকপিকে এক লোক দুপুরে এসে নাজমুলকে সালাম করে একগাল হেসে বললো, খোকাবাপুরা কি তয়ার হয়েছে?

নাজমুল বললো, তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসে গেছো কাসেদ আলী।

বাসে আগে-ভাগে জাগা লিতে হইবে। সানঝের আগে নদী না পার হইলে অতখানি ঘাঁটা যাবে কি কইরা?

নাজমুল সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে টুপুলদের বললো, তোমরা কি তৈরী হয়েছে?

ওরা খাওয়ার আগেই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে। শক্ত খামে গালা দিয়ে মুখ আঁটা একটা চিঠি দিয়েছে নাজমুল। সঙ্গে দুটো প্যাকেট ওদের দুজনকে দিয়ে নাজমুল চাপা গলায় বলেছে, এর ভেতর বোমা বানাবার কিছু মশলা আছে। খুব সাবধানে নিতে হবে।

টুপুল উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, ঝাঁকুনি লাগলে ফাটবে না তো?

ঝাঁকুনি লাগলে ক্ষতি নেই। তবে আগুনের ধারে কাছে রেখো না। জবাব দিয়েছে নাজমুল।

ব্যাগের একবারে তলায় ওটা রেখে তার ওপর ওদের জামা কাপড়, টুথপেস্ট, ব্রাশ, চিরুনি, সাবান, তোয়ালে সব গুছিয়ে নিয়েছে। পথে ঠাণ্ডা লাগলে গায়ে দেয়ার জন্য নাজমুল দুজনকে নতুন দুটো কাশ্মিরী শাল দিয়েছে। পশমিনার মত অত দামী না হলেও বোঝা যায় হেলাফেলার জিনিস নয়। নতুন জিন্স-এর শার্ট প্যান্ট, তার ওপর উলের পুলোভারে চমৎকার মানিয়েছে ওদের। রওনা হবার সময় নাজমুল মিষ্টি হেসে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললো, তোমাদের কলকাতা সফর আনন্দের হোক। আশা করছি আগামী মঙ্গল বুধবারে আমাদের দেখা হবে এখানে। এরপর প্লেনে করে সোজা চট্টগ্রাম।

জীবনে প্লেনে চড়ে নি টুপুল আর জয়। দুজনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জড়িয়ে ধরলো নাজমুলকে—আপনি কি ভালো নাজমুল ভাই!

নাজমুল ওদের পিঠ চাপড়ে হেসে বললো, গুড লাক!

কাসেদ আলী ওদের তাড়া দিলো, তাড়াতাড়ি কইর‍্যা চলেন খোকাবাপুরা। বাসের টাইম হইয়া গেছে।

সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে টুপুল গম্ভীর গলায় বললো, দেখুন কাসেদ আলী সাহেব, আমার নাম টুপুল, ওর নাম জয়। আমরা কেউ খোকা নই। আপনি আমাদের খোকা ডাকবেন না।

কাসেদ আলী এতখানি জিভ কেটে বললো, হামি আপনারঘে নফর। হামাকে নাম লিয়া ডাকবেন। সাহেব, আপনি ইগল্যা কহিবেন না। হামি আপনাঘের টুপুল সাহেব আর জয় সাহেব কহবো।

কাসেদ আলীর কথার ধরণ দেখে টুপুল হেসে ফেললো। জয়কে বললো, ভালোই বিপদ দেখছি।

জয় মৃদু হেসে বললো, ভেরি ইন্টারেস্টিং গাই। আই লাইক হিম।

কিছু না বুঝে কাসেদ আলী পানের দাগওয়ালা কালো কালো সব দাঁত বের করে। কান পর্যন্ত লম্বা এক হাসি দিলো।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দেখলো, একটু আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক্সপ্রেস বাস ছেড়ে গেছে। পরের লোকাল বাস পঁচিশ মিনিট পর ছাড়বে। টুপুল বললো, অল্পের জন্য বাসটা মিস হলো!

কাসেদ আলী দাঁত বের করা হাসির সঙ্গে বললো, ওইট্যাতে আরামে বসা যাইতক না। পিছে বসলে বাসের ঝাঁকুনির চোটে শরীরের হাড়-মাংস সব আলাধা হইয়ো যাইতক।

যেটা ছাড়বে সেটাতে ওরাই প্রথম যাত্রী। সামনের দুজনের সিটে আরামে বসলো ওরা। কাসেদ আলী বিনয়ের দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পাশের সারিতে বসলো। ব্যাগ দুটো ওদের পায়ের কাছে। যখনই মনে হয় ব্যাগের ভেতর বোমা বানাবার বিপদজনক

রাসায়নিক পদার্থ আছে তখনই ওদের হার্টবিট বেড়ে যায়।

তিনটা নাগাদ পুরো বাস বোঝাই হওয়ার পর ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো। দেরিতে ছাড়ার জন্য টুপুলরা মনে মনে বিরক্ত হলেও কাসেদ আলী খুশিই হলো। ও জানে টুপুলদের ব্যাগে কোটি টাকার মাল। এদিকের বাসে প্রায়ই বিডিআর চেক করে। বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ভিসিপি আর যাবতীয় ছোটখাট ইলেকট্রনিকস্ জিনসপত্র এ পথ দিয়ে ভারতে চোরাচালান হয়। যদিও চোরাচালানীদের মাল পাচারের আলাদা রুট আছে–মাঝে মাঝে ওরা লোকাল বাসও ব্যবহার করে ভিড় বেশি হয় বলে। বাসে যাত্রী কম থাকলে বিডিআর-রা সবার ব্যাগ, স্যুটকেস খুলে তন্নতন্ন করে সার্চ করে। যাত্রী বেশি থাকলে তাদের বিরক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খুব বেশি সার্চ করে না। তবে কাউকে সন্দেহ হলে কোনো রেহাই নেই। ভালো করে সার্চ করার জন্য অনেক সময় তাদের বাস থেকে নামিয়ে রেখে দেয়া হয়। কিছু না পেলে পরের বাসে তুলে দেয়, আর পেলে সোজা থানায়।

দুটো স্টপেজ পরে বাসে এত বেশি লোক হয়ে গেলো যে পাদানিতে পা রাখার পর্যন্ত জায়গা নেই। কাসেদ আলী আহ্লাদে আটখানা হয়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বের করে বাবাজর্দা দিয়ে এক সঙ্গে

দুখিলি পান মুখে পুরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে লাগলো। ও মনে মনে পথে যে কটা ফাড়া ভেবে রেখেছে এই বাসযাত্রা তার ভেতর একটা।

গভীর আহ্লাদে কাসেদ আলী আপন মনে বেসুরো গলায় নূরজাহানের পুরোনো গান–আ ইন্তেজার হ্যায় তেরা, দিল বেকারার হ্যায় মেরা গাইতে শুরু করেছিলো। অর্ধেক গান না গাইতেই হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে থামতে হলো ওকে। সামনে বিডিআর চেকপোস্ট বসেছে। আচমকা ব্রেক কষাতে কাসেদ আলী নিজেকে সামলাতে না পেরে আঁক করে পাশে বসা মোটাসোটা লোকের ঘাড়ে হুমড়ি খেলো। সেই লোক গিয়ে পড়লো তার স্ত্রীর ঘাড়ে। বোরখা পরা মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো, চোখের মাথা খাইছ! নিজেকে সামলে ভদ্রলোক কটমট করে তাকালেন কাসেদ আলীর দিকে।

কাসেদ আলী নার্ভাস গলায় শুধু বললো, বিডিআর।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বললো, বিডিআর কি বাঘ-ভালুক, না আমি চোর-বাটপার যে নাম শুনলে ডরামু?

ততক্ষণে বিডিআর-এর জোয়ানরা বাসে উঠে তল্লাসি শুরু করেছে। ভদ্রলোকের শেষের কথা কানে যেতে একজন ওদের দিকে এগিয়ে এলো কোথায় চোর-বাটপার দেখি?

কাসেদ আলীকে দেখিয়ে লোকটা বললো, অরে জিগান বিডিআর-এর কথা শুইন্যা গান গাওন বন্ধ ওইয়া গ্যাছে ক্যা?

কি গান? জানতে চাইলো বিডিআর ।

নূরজাহানের গান-ইন্তিজার হ্যায় তেরা গাইতাছিলো।

আপনি কি করেন ইন্তেজার মিয়া? প্রশ্ন করা হলো কাসেদ আলীকে।

আমার নাম কাসেদ আলী। আমের কারবারি।

আপনার ব্যাগটা বের করেন।

হামার কুনো ব্যাগ-ট্যাগ নাইখো।

বিডিআর-এর আরেকজন লোক টুপুল আর জয়কে বললো, আপনাদের ব্যাগ দুটো খুলুন।

কাসেদ আলীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। আড়চোখে টুপুল আর জয়কে দেখে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মনে মনে সুরা এখলাস পড়তে লাগলো। কাসেদ আলী এই সুরার ফজিলত জানে। তিনবার সুরা এখলাস পড়া একবার কোরান খতমের সমান।

ব্যাগের তালা খুলে চেইন টানতে গিয়ে টুপুল আর জয় দুজনই ঘেমে গেলো। যদিও লোকটা ওদের খোকা না বলে আপনি বলেছে, শুনতে ভালো লাগতো যদি না ব্যাগ খুলতে বলতো।

চেইন খোলার পর বিডিআর–এর লোকটা ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলো ভেতরে কি আছে?

টুপুল ওপরের কাপড়-চোপড় বের করতে করতে বললো, আমাদের জামাকাপড়।

জয় ওর জামাকাপড় দেখাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই নতুন কেনা সাবানটা ফেলে দিলো, যেন হাত থেকে ফসকে পড়ে গেছে।

বিডিআর-এর লোকটা জয়ের সাবান কুড়িয়ে হাতে দিয়ে আবার প্রশ্ন করলো, কোথায় যাবেন আপনারা?

টুপুল জবাব দিলো–চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাচার বাড়িতে। আর বেশি কিছু বললো না, যদিও নাজমুল তথাকথিত চাচার নাম-ঠিকানা সব বলে দিয়েছিলো।

ঠিক আছে। বলে পেছনের দিকে এগিয়ে গেলো জোয়ানটা।

ততক্ষণে কাসেদ আলীর সুরা এখলাস তিনবার পড়া শেষ করেছে। ওর মনে হলো সুরা এখলাসের কারণেই এবারের ফাঁড়াটা কেটেছে। হাঁপ ছেড়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বের করে আবার দুখিলি একসঙ্গে মুখে গুজলো। বাস ছাড়ার পর আড়চোখে পাশের লোকটাকে দেখে আপন মনে বললো, বাসে গান গাহা কেহু মানা কহে নি। হামার যত খুশি হামি গান করবো।

টুপুল আর জয় কাসেদ আলীর রাগ আর অভিমান উপভোগ করছিলো। জয় জিজ্ঞেস করলো, এবার কি গান হবে ইন্তেজার আলী?

কাসেদ আলী ঢক করে পানের পিকটুকু গিলে পুরোনো হিন্দি ছবির গান ধরলো–ইচিক দানা, বিচিক দানা, দানা উপ্পর দানা–

কাসেদ আলীর পাশে বসা মোটা লোকটা এসব উৎপাত পছন্দ না করলেও অন্যদের আগ্রহ দেখে গোল মুখখানা আরো গোল করে চুপচাপ বসে রইলো। টুপুলদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই দারুণ মজা লাগছিলো। ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে এভাবে রেহাই পেয়ে ওরা কাসেদ আলীর বেসুরো গানের সমঝদার হয়ে ওকে একের পর এক গাইবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলো। বাসের অন্য যাত্রীরাও দুটি মিষ্টি চেহারার কিশোরের আনন্দে বাধা দিতে চাইলো না।

দেড়ঘন্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসে যখন ওরা নামলো সূর্য তখন মহানন্দা নদীর ওপারে ডোবার আয়োজন করছে। কাসেদ আলী বললো, ফেরি পার হইয়্যে হামারঘের টেম্পো ধইরতে হবে।

বাসের বেশির ভাগ যাত্রী এপারেই রয়ে গেলো। টুপুলদের সঙ্গে জনাচারেক ফেরিতে উঠলো। ফেরি ছাড়ার পর জয় বললো, ঢাকায় আমাদের বন্ধুরা এখন কাগজিটোলা ক্লাবে বসে আড্ডা দিচ্ছে। অথচ আমরা কোথায়!

টুপুল বললো, তোর কি বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে?

আমি বুঝি তাই বললাম? আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের কথা কোনোদিন যদি ওরা শোনে–হিংসেয় পেট ফেটে মরে যাবে।

ফেরিতে মহানন্দা পেরিয়ে ওরা একটা টেম্পো পেয়ে গেলো। যাত্রী ওরা তিনজনই। টেম্পোওয়ালা বললো, পরের ফেরি এলে ও গাড়ি ছাড়বে। কাসেদ আলী বললো, হামারঘের দেরি হইয়ে যাবে। বাকি তিনজনের ভাড়া হামি দেবো। তুমি গাড়ি ছাড়।

বারঘরিয়ার অর্ধেকের বেশি রাস্তা পাকা ছিলো, আরামেই আসছিলো ওরা। হঠাৎ সন্তোষপুরে এসে বাঁ দিকে ইট বিছানো রাস্তায় টার্ন নেয়ার পর ওদের খবর হয়ে গেলো। পুরো রাস্তা উঁচু-নিচু, যেখানে সেখানে ইট খোয়া উঠে গর্ত হয়ে গেছে। টেম্পো চলছিলো এক পা খোঁড়া কুকুরের মত লাফাতে লাফাতে। টুপুল কাসেদ আলীকে বললো, বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে গেলে হয় না?

পারবেন দু মাইল হাঁটতে?

কাসেদ আলীর প্রশ্ন শুনে ওরা ঠোঁট উল্টালো–দু মাইল কোনো দূর হলো নাকি।

টেম্পো বিদায় করে ওরা দুপাশে কুয়াশা ঢাকা ন্যাড়া ধান ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে আলপথে শর্টকাট ধরলো। কাসেদ আলী জোর করে ওদের ব্যাগ দুটো নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। নাজমুল যদি শোনে টুপুলদের দু মাইল হাঁটিয়েছে, কাসেদ আলীকে আস্ত রাখবে না।

আকাশে যখন রূপোলি থালার মতো ঝকঝকে চাঁদ দেখা গেলো তখন ওরা মস্ত এক আম বাগানের ভেতর বড়সড় মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তিন পাশে ঘর, মাঝখানে উঠোন। উঠোনে ওদের দাঁড়াতে দেখেই ভেতর থেকে সাদা চুলদাড়িওয়ালা এক বুড়ো বেরিয়ে এলো। কাছে এসে চাপা গলায় বললো, কাসেদ আলী, সর্বনাশ হয়েছে। আজ সকাল থেকে পুরো বর্ডার সিল করে দিয়েছে, বিডিআরের এক বড় সাহেব নাকি এসেছে।

.

০৬.

আপনারা সবভাই তাহিলে কহিছেন দুদিন হামারঘের এরম গা ঢাকা দিয়্যা থাকতে হইব্যে?

কাসেদ আলীর প্রশ্ন শুনে চারপাশে যারা বসেছিলো তারা সরদার সাহেবের দিকে তাকালো।

রাত তখন সাড়ে দশটা। তিনঘন্টা আগে নারায়নপুর এসে বুড়ো নইমুদ্দিনের মুখে বিপদের কথা শুনে ওরা আর ওখানে অপেক্ষা করে নি। আমবাগানের ভেতর দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে পনেরো মিনিট হেঁটে সরদার আলী আসগরের বাড়িতে এসে উঠেছে। এ এলাকায় সবচেয়ে নিরাপদ বাড়ি এটা। বহুদিন সংস্কার না করা সাবেকি ধরনের দোতালা বাড়ি। সরদার আলি আসগর শুধু ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নয়, নাজমুলদের দলের সঙ্গেও জড়িত। কাসেদ আলীর গলার আওয়াজ শুনে নিজেই বেরিয়ে এসে ওদের ভেতরের এক ঘরে নিয়ে বসিয়েছে। সরদারের বয়স নাজমুলের চেয়ে কম হলেও ঘাড়ে-গর্দানে প্রচুর চর্বি আর গোলগাল একটা ভুড়ি থাকার কারণে মনে হয় চল্লিশের ওপর বয়স। কাসেদ আলীর কাছে নইমুদ্দিনের বিপদের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, উ যদি সাহস না করে তাহিলে তো মুশকিল! তাও হামি আর সভারি খবর পাঠাছি। আপনারা হাতমুখ ধুইয়্যা খাওয়া-দাওয়া করেন। দেখি কি করা যায়।

দেখা-দেখির কিছু নাই। যে কইর‍্যাই হউক হামারঘেরকে পার হইতে হইবে। শুকনো আদেশের গলায় বললো কাসেদ আলী, হামারঘের পার না কইর‍্যা আক্কাস ভাই যাইবেন না।

সরদারের হাঁকডাকে টুপুলদের বয়সী একটা কাজের ছেলে ছুটে এলো। ওকে মেহমানদের দেখাশোনা করার নির্দেশ দিয়ে নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দশ মিনিটের ভেতর বালতিতে করে মুখ-হাত ধোয়ার পানি, সাবান, গামছা সব নিয়ে ভেতরের বারান্দায় নিয়ে গেলো ওদের। মুখ ধুতে গিয়ে টুপুলরা টের পেলো বালতিতে গরম পানি মেশানো হয়েছে। মুখ-হাত ধোয়া শেষ হলে রুস্তম জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি চা খাইবেন এখন?

পেলে তো ভালোই হয়। বলে কাসেদ আলীর দিকে তাকালো টুপুল।

কাসেদ আলী ব্যস্ত গলায় বললো, তাড়াতাড়ি চা আন। এরা সব শহরের মানুষ। ঘন্টায় ঘন্টায় চা লাগে।

রুস্তম চলে যাওয়ার পর জয় হেসে বললো, কক্ষনো আমাদের ঘন্টায় ঘন্টায় চা লাগে না কাসেদ আলী।

কাসেদ আলী খুব চিন্তিত ছিলো। জয়ের কথার কোনো জবাব দিলো না। চা খেয়ে জয় আর টুপুল ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকা বনেদি এক পালঙ্কে উঠে বসলো।

হারিকেনের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখা না গেলেও সরদারদের অবস্থা যে খুব ভালো এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না ওদের।

আপনারা আরাম করেন। হামি একটু ঘুইর্যা আসছি। এই বলে কাসেদ আলী তখন যে বেরিয়েছে ফিরেছে একটু আগে। ততক্ষণে রুস্তম ঘরের মেঝেতে দস্তরখান বিছিয়ে ওদের তিনজনের জন্য খাবার এনে সাজাতে শুরু করেছে।

কাসেদ আলীর সঙ্গে সরদার আলী আসগর আর দুটো অচেনা লোক এসেছে। কাসেদ আলী টুপুলদের সঙ্গে নিচে বসলো।

টুপুলদের প্লেটে ভাত-তরকারি তুলে দিচ্ছিলো রুস্তম। চেয়ারে বসে তদারক করছিলো সরদার। বিনয় দেখিয়ে ওদের বললো, গরিবের বাড়িতে সামান্য ব্যবস্থা। নিজের বাড়ি মনে কইর‍্যা খান আপনারা।

আয়োজন মোটেই সামান্য ছিলো না। মস্তবড় এক বাটি মুরগীর মাংস, ডিমের ঝোল, সবজি ভাজি আর দুরকমের ডাল। টুপুল বললো, এসব যদি সামান্য হয় তাহলে আর বাকি থাকলো কি।

খেতে গিয়ে জয় আর টুপুল টের পেলো মুরগি আর ডিম দুটো আগুনের মতো ঝাল। একটুখানি মুখে দিতেই ওদের নাক আর চোখের পানি একাকার হয়ে গেলো। তখনই কাসেদ আলী প্রশ্নটা করলো।

ওর প্রশ্ন শুনে সরদার একটু ভেবে বললো, হামি কুনু রকম ঝুঁকি ল্যাওয়ার পক্ষপাতি লই। দুদিন দেরি হইল্যে যুদি ঝামেলা কাটে ক্ষতি কি! জানি কুটুমের এখ্যান একটু অসুবিধা হইবে। তাউ আর কুনু উপায় তো দেখছি না।

ফোঁৎ করে নাকের পানি টেনে টুপুল বললো, আমাদের অসুবিধে হবে না।

কাসেদ আলী আপন মনে চিন্তিত গলায় বললো, কইলকাতার পার্টি না ফের বিগড়া যায়।

কেউ ওর কথার কোনো জবাব দিলো না। একটু পরে কাসেদ আলী আবার বললো, সরদার সব কিছু ভাইব্যা চিন্তা কহো কুটুমের এখানে থাকা কতটুকুন নিরাপদ?

অন্য যে কুনু বাড়ির চাহিতে হামার বাড়ি নিরাপদ। সরদারের গলায় আত্মতৃপ্তি– এখ্যানে থাইকল্যে কাকপক্ষিও টের পাইবে না।

ঠিক আছে। খেয়ে উঠে বড় গামলায় হাত ধুতে ধুতে কাসেদ আলী বললো, কাইল হামি তাহিলে রাজশাহী থেইক্যা ঘুইরা আসি। খবরটা ছোট হুজুরকে কহা দরকার।

খাওয়ার পর এঁটো থালাবাসন সব তুলে নিয়ে রুস্তম বড় পালঙ্কে মশারি এনে লাগালো। কাসেদ আলী টুপুলদের বললো, আপনারা এ ঘরে নিন্দ যাইবেন। চিন্তার কুনু কারণ নাই। আমি অন্য ঘরে নিন্দ যাছি।

বহুদূরে একটা-দুটো শেয়ালের ডাক আর মাঝে মাঝে ঝিঁঝি পোকার শব্দ ছাড়া পৃথিবীর কোথাও কোনো শব্দ নেই। ঘরের জানালা বন্ধ থাকলেও উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে যেভাবে হুহু করে বাতাস

ঢুকছিলো তাতেই লেপ-তোশক-বালিশ সব ভিজে ভিজে হয়ে আছে। ওসবের পরোয়া না করে টুপুলরা লেপের তলায় ঢুকলো। হারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে রুস্তম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

নতুন জায়গায় ঘুম আসতে দেরি হওয়ার জন্য সকালে টুপুল আর জয় উঠলো দেরি করে। দেয়ালে ঝোলানো পুরোনো এক ঘড়িতে ঘড় ঘড় করে নটার ঘন্টা বাজলো। ওদের ওঠার শব্দ হতেই রুস্তম এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, হাত-মুখ ধুইয়া ল্যান। নাশতা রেডি হইয়া গেছে।

টুপুল হাই তুলতে তুলতে বললো, এ বাড়িতে তুমি কদ্দিন ধরে আছো রুস্তম?

চমকে উঠে রুস্তম টুপুলের দিকে তাকালো। তারপর কোনো কথা না বলে ও হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। টুপুল অবাক হয়ে–স্ট্রেঞ্জ বলে জয়ের দিকে তাকালো। জয় কাঁধ নাচিয়ে ঠোঁট ওল্টালো।

নাশতা ওদের ঘরেই দেয়া হলো। রুস্তমের গম্ভীর চেহারা দেখে টুপুল ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না জয় বললো, নাজমুল ভাই কি বলেছিলেন মনে আছে? কোনো বিষয়ে যেন কৌতূহল না দেখাই।

টুপুল আপন মনে বললো, বাড়ির চাকর কদ্দিন কাজ করে এটা গোপন করার মতো খবর নাকি!

পরোটা, আলুভাজি আর ডিম দিয়ে আয়েশ করে নাশতা সারলো। একটু পরে রুস্তম এসে দুকাপ চাও দিয়ে গেলো। চা শেষ করতেই সরদার এসে ঘরে ঢুকলো। একটু অপরাধী গলায় বললো, কাঙ্গালের বাড়িতে আইসছেন। চাইরদিকে একটু ঘুইর্যা বেড়াতে কহবো তারও উপায় নাই।

টুপুল ব্যস্ত গলায় বললো, বেড়াবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আমরা ঘরের ভেতর খুব আরামে আছি।

ঘরে বইস্যা গান শুনতে পারেন। হামি টুইন ওয়ান পাঠিয়ে দিছি। এই বলে সরদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে রুস্তম আলী মাঝারি সাইজের একটা টু-ইন-ওয়ান আর সাত আটটা ক্যাসেট দিয়ে গেলো। দুটো মোহাম্মদ রফি আর রুনা লায়লার, বাকি সব পাকিস্তানী সিনেমার গান। দুপুর পর্যন্ত ক্যাসেট বাজিয়ে শুয়ে-বসে কাটালো টুপুল আর জয়। একটার দিকে রুস্তম ওদের নিয়ে গেলো বাড়ির ভেতরের গোসলখানায়। দেখেই বোঝা যায় এটা মেয়েদের জন্য। একটু অস্বস্তি লাগলেও করবার কিছু নেই। বালতিতে গরম পানি ছিলো। ঝটপট গোসল সেরে ওরা নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ততক্ষণে রুস্তম মেঝেতে পাটি বিছিয়ে দুপুরের খাবার সাজিয়েছে।

টুপুলরা খেতে বসার পর দরজার কাছে চুড়ির শব্দ শুনলো। ওদিকে তাকাতেই রুস্তম বললো, হামারঘে বেগম সাহেব।

বড় ঘোমটা টানা ছোটখাট বেগম সাহেব ঘরে এসে ঢুকলো। রুস্তমকে ইশারায় যেতে বলে নিজে ছোট মোড়াটায় বসলো। ঘোমটা ছোট করে বললো, শুনলাম ঝাল বেশি হয়েছে বলে কাল তোমরা কিছু খেতে পারো নি। তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না। তোমরা আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী।

টুপুল ব্যস্ত হয়ে বললো, আমাদের তুমিই বলবেন আপা। আজকের রান্না খুব সুন্দর হয়েছে।

বেগম সাহেব মৃদু হেসে ওদের পাতে দুটুকরো রুই মাছ তুলে দিয়ে বললো, আজ আমি রান্না করেছি। এদিকে মাছ পাওয়া যায় না। সকালে জেলে ডাকিয়ে মাছ ধরিয়েছি। তোমাদের দেখে আমার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেছে।

কোথায় থাকে আপনার ভাই?

ছিলো, মুর্শিদাবাদে। আমাদের বাড়ি ওখানে জলঙ্গিতে। দুবছর আগে ভাইটা নৌকা ডুবে মারা গেছে। বলতে গিয়ে বেগম সাহেবের গলা ভারি হয়ে এলো।

টুপুল সমবেদনার গলায় বললো, আপনার আর কোনো ভাই নেই?

টুপুল আর জয় কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেতে লাগলো। বেগম সাহেব ওদের পাতে দুহাতা মুড়িঘন্ট তুলে দিয়ে বললো, লজ্জা কোরো না। পেট ভরে খাও। তোমরা বুঝি ঢাকা থাকো?

মুখ ভর্তি ভাত ছিলো। টুপুল মাথা নেড়ে সায় জানালো। বেগম সাহেব আবার প্রশ্ন করলো, এদের সঙ্গে কদ্দিন ধরে আছো?

বেশি দিন নয়। পরীক্ষা ভালো হয় নি বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। নাজমুল ভাই-র সঙ্গে স্টিমারে দেখা। সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আছি।

তোমরা যা করছো, সবকিছু বুঝে শুনে করছো তো?

টুপুল কি বলবে ঠিক করতে পারলো না। ওর মনে হলো এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে গেলে গোপনীয়তার শর্ত ভাঙা হবে। বেগম সাহেবের কথার জবাবে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানালো।

বেগম সাহেব আবার বললো, একাজে কি রকম বিপদ জানা আছে?

এবারও টুপুল মাথা নেড়ে সায় জানালো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেগম সাহেব আপন মনে বললো, কে জানে কোন্ মায়ের নাড়িছেঁড়া ধন তোমরা।

টুপুল নিচু গলায় বললো, আমার মা নেই। জয়ের আছে।

মা না থাকলেও বাবা তো আছেন?

জয় শক্ত গলায় বললো, বাবা আমাকে দুচোখে দেখতে পারেন না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বেগম সাহেব চাপা গলায় বললো, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

এমন সময় বাইরের বারান্দায় সরদারের গলা শোনা গেলো, রুস্তমকে ডাকছে। বেগম সাহেব চমকে উঠে টুপুল আর জয়কে অবাক করে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

খেয়ে উঠে বিছানার লেপের তলায় ঢুকে টুপুল বললো, বেগম সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে বিপ্লবীদের গোপন কাজ তিনি পছন্দ করেন না।

জয় বললো, তাতে কি! মেয়েরা কোনো ঝামেলার কাজেই পছন্দ করে না।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে টুপুল বললো, তোর কি মনে হয় আমরা ভুল করতে যাচ্ছি?

না। হাই তুলে জয় বললো, অনেকে বিপ্লব চায় না। সমাজটা বদলাতে চায় না। কিন্তু আমি চাই।

জয়কে হাই তুলতে দেখে টুপুল আর কথা বাড়ালো না। নাজমুলের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হয়েছে সমাজটা বদলানো দরকার। একই সঙ্গে একটু আগে হঠাৎ পরিচিত অচেনা বোনটির কথাও ওর বুকের ভেতর খচখচ করতে লাগলো। ওর কথা শুনে মনে হয়েছে ওরা বুঝি ভীষণ অন্যায় কোনো কাজ করতে যাচ্ছে।

টুপুলরা যখন রাতের খাওয়া শেষ করেছে তখনই কাসেদ আলী ফিরলো রাজশাহী থেকে। সরদার ওদের খাওয়া তদারক করছিলো। কোন রকম ভূমিকা না করে কাসেদ আলী সরদারকে বললো, যে কইর‍্যা পারো আইজ রাইতেই হামারঘে পার করার ব্যবস্থা করো। দেরি কইরল্যে অবস্থা আরো খারাপ হইবে।

কি খারাপ হইবে? প্রশ্ন করলো সরদার।

তোমার এ বাড়িও নিরাপদ নয়। শুকনো গলায় বললো কাসেদ আলী।তোমার বাড়ি থাইক্যা মাল ধরা পড়লে খুবই বিপদ হইবে।

ঠিক আছে আমি তোরাপ আর নইমুদ্দিনকে এখনই খবর পাঠাছি। আসল লোক তো অরাই।

যা করার তাড়াতাড়ি কর। এই বলে কাসেদ আলী টুপুলদের দিকে তাকালো–আইজ রাইতে যাইত্যে কি অসুবিধা হইবে আপনারঘে?

অসুবিধা কিসের? টুপুল শান্ত গলায় বললো, আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসল ঠিকানায় পৌঁছতে।

আধঘন্টা পর সরদারের সঙ্গে জনাচারেক লোক ঘরে ঢুকলো। গতকালের বুড়ো নইমুদ্দিন ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলো না টুপুলরা। কাসেদ আলী সবাইকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কি শলা-পরামর্শ করলো তার কিছুই জানা গেলো না। আধঘন্টা পর কাসেদ আলী এসে বললো, আপনারঘে ব্যাগ রেডি আছে তো?

টুপুল আর জয় যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বসেছিলো। কাসেদ আলীর কথা শুনে ওরা ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালো। রুস্তম আড়ালে কোথাও ছিলো। টুপুলদের ব্যাগ তুলতে দেখে ও এগিয়ে এলো–হামাকে দ্যান। আমি আগিয়া দি।

কাসেদ আলী রুস্তমকে চাপা গলায় ধমক দিলো–তুই ভিতরে যা। এটা তোর কাম লয়।

মুখ কালো করে চলে গেলো রুস্তম। জয় আর টুপুলের মনে হলো বেচারাকে এভাবে ধমক না দিলেও চলতো। প্রথম বারের মত কাসেদ আলীর ওপর রাগ হলো ওদের।

সরদার বাড়ির চারপাশে বিশাল আমবাগান। এ মাথা থেকে ও মাথা পাহারা বসানো হয়েছে। টুপুল আর জয়ের চোখে না পড়লেও কাসেদ আলীর চোখে ঠিকই পড়েছে। বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এসে ওদের বিদায় দিয়েছে সরদার। ওদের সঙ্গে বাড়তি লোক বলতে শুধু নইমুদ্দিন। আমবাগানের ভেতর জ্যোত্সা আর কুয়াশার লুকোচুরি খেলা চলছে। চারপাশের পরিবেশ ছিলো অদ্ভুত মায়াময়। টুপুল আর জয় সরদার বাড়ি থেকে বেরোবার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কায় এমনই উৎকণ্ঠিত ছিলো যে, বাগানের ভেতর জ্যোৎস্নার অপরূপ আল্পনাও ওদের চোখে পড়লো না। নিঃশব্দে দ্রুত হাঁটছিলো ওরা।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর দূরে একটা টর্চের আলো দুবার জ্বলে নিভে গেলো। নইমুদ্দিনের হাতের ইশারায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই আম গাছের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো পাথরের মূর্তির মত। কিছুক্ষণ পর যেন মাটি খুঁড়ে বের হলো কালো চাদর মোড়া এক লোক। নঈমুদ্দিনের কানে কানে কি যেন বললো। নইমুদ্দিন সেই কথাগুলো আবার কাসেদ আলীর কানে ফিসফিস করে বললো। কালো চাদর মোড়া লোকটা যেভাবে এসেছিলো সেভাবে উধাও হয়ে গেলো। ওরা একক্ষণ হাঁটছিলো পশ্চিম মুখ করে। এবার দিক পরিবর্তন করে ওরা দক্ষিণ দিকে হাঁটলো। এদের সতর্কতা দেখে টুপুল আর জয়

দুজনই স্বস্তি বোধ করলো। ওদের বুকের ওপর চেপে থাকা উদ্বেগের ভারি বোঝাটা অনেক হালকা হয়ে গেলো।

কোথাও না থেমে একটানা চারঘন্টা হাঁটার পর ওরা এক ভোলামেলা প্রান্তরের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। ততক্ষণে চাঁদ ডুবে গেছে পশ্চিমের ঘন কালো আমবাগানে। আকাশ জুড়ে লক্ষ তারার মেলা। কাসেদ আলী এতক্ষণ ধরে ওর জানা যাবতীয় সুরা আর দোয়াদরুদ কয়েকবার পড়ে শেষ করেছে। এবার হালকা গলায় বললো, আল্লার রহমতে বালা-মুসিবত দূর হয়েছে।

নইমুদ্দিন বললো, আমাকে কি আরো যাইতে হইবে?

না না! অমায়িক গলায় কাসেদ আলী বললো, তোমাকে আর কষ্ট দিবো না। পদ্মার ওপারে হামারঘে লোক আছে।

নইমুদ্দিন চলে যাবার পর টুপুল বললো, পদ্ম কতদূর এখান থেকে?

নরম বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে কাসেদ আলী বললো, হামরা পদ্মার ওপর দিয়া হাঁটছি।

ঠাট্টা করছো কেন? আমি পদ্মা নদীর কথা বলছি।

ঠাট্টা লয় মিয়া। কাসেদ আলী শান্ত গলায় বললো, ফারাক্কা বাঁধ পদ্মা নদীকে এভাবে গলা টিপ্যা খুন কইর‍্যাছে। এইখান থাইক্যা মাইল দশেক উজানে গেলেই ফারাক্কা।

শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার করুণ চেহারা দেখে টুপুলের খারাপ লাগলো। মিনিট দশেক হাঁটার পর এক চিলতে নালার মত পানি বয়ে যেতে দেখলো। জুতো খুলে পার হলো ওরা। হাঁটুও ডুবলো না। চারপাশের জমাটবাধা কুয়াশা। টুপুল বললো, এই কুয়াশায় পথ চিনবে তো কাসেদ আলী?

কাসেদ আলী যেতে যেতে বললো, ই ঘাটা হামার হাতের তাইলার মতন মুখস্থ। আজ রাইতে কুয়াশা আল্লার রহমত হইয়্যা নাইম্যাছে।

আরো পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ করেই গাছপালা ঘেরা গ্রাম ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

টুপুল বললো, ইন্ডিয়া আর কতদূর কাসেদ আলী?

ততক্ষণে ওরা একটা টিনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাসেদ আলী বললো, হামরা এখন ইন্ডিয়ায়। তারপর গলা তুলে ডাকলো, নিবারণ বাড়িতে আছো?

৭-৯. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমরা এখন কোলকাতায়। পরদিন সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বাঁধানো বেঞ্চে বসে মুগ্ধ গলায় বললো জয়।

বহরমপুর থেকে ভোরে ট্রেনে উঠে দুপুরেই কলকাতা পৌঁছে গেছে ওরা। কাসেদ আলী ওদের সার্কুলার রোডের এক উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়িতে রেখে বিকেলে ফিরে গেছে। বলেছে, চারদিন পর ওদের নেয়ার জন্য ও নিবারণের বাড়িতে অপেক্ষা করবে। এখান থেকে ওদের বহরমপুরে নিবারণ দাসের বাড়ি পৌঁছে দেয়া হবে।

টুপুলরা যে বাড়িতে উঠেছে সেটার নাম সুভদ্রা ভিলা। নাজমুলের বিজনেস পার্টনার প্রতুল সাহার বাড়ি। নাজমুলের চিঠি পড়ে ওদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালো প্রতুল। প্যাকেট দুটো পেয়ে মনে হলো প্রতুল বুঝি বিশ্ব জয় করেছে। নাজমুলের বয়সী হবে, গায়ের রঙ শ্যামলা, রুক্ষ চেহারা, স্পোর্টসম্যানদের মত ছিপছিপে পেটা শরীর। হেসে বলেছে, তোমরা যখন নাজমুলের বন্ধু হতে পেরেছো আশা করি আমিও তোমাদের বন্ধু হতে পারবো। এটা তোমাদের নিজের বাড়ি মনে করবে। এ যাত্রা অবশ্য চারদিনের বেশি থাকতে পারছে না। তবু কলকাতার যা কিছু দেখার আছে সবই শ্যামল তোমাদের দেখিয়ে দেবে। এই বলে প্রতুল ওর ড্রাইভার শ্যামলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামল দেখতে একটু চালবাজ মনে হলেও কথা বললো খুব বিনয়ের সঙ্গে, দাদাবাবুরা কি এখন বেরোবেন, না কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন?

বিশ্রামের কি আছে? জয় বললো,প্রতুলদার যদি অসুবিধে না হয়...

আমার কোন অসুবিধে হবে না। ব্যস্ত গলায় প্রতুল বললো, আমার আরেকটা গাড়ি আছে, নিজে চালাই। শ্যামলকে রাখাই হয়েছে গেস্টদের জন্য। তোমরা যত খুশি বেড়াও। ইচ্ছে হলে বাইরে খেতে পারো। বাড়িতেও খেতে পারো। নাজমুলের মত আমিও ব্যাচেলার। ঠাকুরকে শুধু বলে দিও কখন কি খেতে চাও। আমাকে সব সময়। নাও পেতে পারো।

প্রতুলের আতিথেয়তায় মুগ্ধ দুই কিশোর-অতিথিকে সবার আগে শ্যামল চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরিয়ে এনেছে। তারপর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম দেখিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সামনে এসে বসেছে।

তাজমহলের এই ক্ষুদে সংস্করণ দেখে দুচোখ ভরে গেছে টুপুল আর জয়ের। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফোয়ারাগুলোতে নানা রঙের আলোর ধারা এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে গেছে ওদের। শ্যামল এরই ভেতর আগামী চারদিনের ভ্রমনসূচি তৈরি করে ফেলেছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে বসে বাদাম খেতে খেতে শ্যামল বললো, আজ রাতে তাহলে আমরা বাড়িতে খাচ্ছি না। পার্ক স্ট্রিটে পাঞ্জাবীদের একটা ফাইন রেষ্টুরেন্ট আছে। ওরা বলে ধাবা। টুপুলদাদা জয়দাদা নিশ্চয় পাঞ্জাবী খানা কখনো খাওনি?

ঢাকায় কোথায় পাবো পাঞ্জাবী ধাবা? হেসে বললো টুপুল। জয় মনে মনে মনে বললো, থাকলেও কি কিনে খাবার সামর্থ আছে আমাদের?

শ্যামল বললো, তোমাদের সিনেমা দেখতে ভালো লাগে?

লাগে না আবার! উত্তেজিত গলায় টুপুল বললো, ভিসিআর-এ বোম্বের অনেক হিন্দি ছবি দেখেছি।

সঞ্জয় দত্তের ছবি ভালো লাগে?

সঞ্জয় আমার ফেভারিট।

সঞ্জয়ের একটা নতুন ছবি রিলিজ হয়েছে। নাইট শোতে দেখবে ওটা?

নাইট শো কটায় শুরু হয়?

সাড়ে আটটায়। শেষ হতে হতে এগারোটা বেজে যাবে।

দেরিতে বাড়ি ফিররে প্রতুলদা যদি তেমার ওপর রাগ করেন?

দাদা কখনো আমার ওপর রাগ করেন না। তোমরা দাদার বিশেষ অতিথি, নাজমুল দাদার বন্ধু। তোমরা খুশি হলে দাদাও খুশি হবেন।

তাহলে নাইট শো দেখা যেতে পারে। জয় কি বলিস? তোর ঘুম পাবে না তো?

পাগল হয়েছিস? গদগদগলায় বললো জয়।

পাঞ্জাবীদের ধারায় তন্দুরি চিকেন, পনির মটর আর কাবাব দিয়ে রাতের খাবার সারলো ওরা তিনজন। তারপর প্যারাডাইস সিনেমায় সঞ্জয় দত্তের দারুণ এক ফাইটিং ছবি দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে পৌনে বারোটা।

নিচের তলার ড্রইংরুমে অচেনা এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলো প্রতুল। ওদের সামনে ছোট টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাস। টুপুলদের দেখে গলা তুলে প্রতুল বললো, হাই ফ্রেন্ডস, কেমন বেড়ালে?

মেনি থ্যাংকস প্রতুলদা! টুপুল উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, ছবি পর্যন্ত দেখা হয়ে গেছে।

প্রতুল হেসে বললো, ছবি দেখার আইডিয়াটা নিশ্চয় শ্যামলের।

আইডিয়া ওর হলে কি হবে–আমরা বোম্বের ছবি দারুণ পছন্দ করি।

শ্যামল আমার এক সত্তর বছরের কানাডিয়ান গেস্টকে সঞ্জয় দত্তের ফ্যান বানিয়ে ছেড়েছে। যাবার সময় ও সঞ্জয়ের যত ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পেয়েছে সব কিনে নিয়ে গেছে। বলে হা হা করে হাসলো প্রতুল।

টুপুল আর জয় হাসিমুখে ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রতুলের বাড়িটাকে বাইরে থেকে বেশ পুরোনো মনে হলেও ভেতরে আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থাই আছে। দুপুরে কাজের ছেলে হরি ওদের ঘর, ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং রুম, বাথরুম সব দেখিয়ে দিয়েছে। শ্বেত পাথরে বাঁধানো বিরাট বাথরুম। একপাশে বাথটাব, শাওয়ার, ঠাণ্ডা পানি, গরম পানি, দামী তোয়ালে, সাবান, কোলন সবই আছে। টুপুল তখনই জয়কে বলেছিলো, প্রতুলদারা কী বড়লোক দেখেছিস? জীবনেও এত সুন্দর বাথরুম দেখিনি।

সুভদ্রা ভিলাতে প্রতুল ছাড়া মানুষ মাত্র দুজন। একজন হরি, আরেকজন রাঁধুনি ঠাকুর। ড্রাইভার শ্যামল এ বাড়িতে থাকে না। হরিকে জিজ্ঞেস করেছিলো ওপরে কে থাকে। হরি গম্ভীর হয়ে বলেছে, দোতলায় বাবুর পূজোর ঘর। বাইরের কারো ওপরে যাওয়া বারণ। নিচের তলায় ড্রয়ং, ডাইনিং, কিচেন আর তিনটা শোবার ঘর। একটায় প্রতুল নিজে থাকে। হরি জিজ্ঞেস করেছিলো টুপুলরা আলাদা ঘরে থাকবে কি না। বড় বিছানা দেখে টুপুল বলেছে ওরা একসঙ্গে থাকবে। বড় বড় নির্জন ঘরগুলোতে একটা গা-ছমছমকরা ভাব আছে। আসবাবপত্র সব পুরোনো অথচ বোঝা যায় খুব দামী। নকশা করা দরজা-জানালায় ভারি ভেলভেটের পর্দা। সুদা ভিলার সব কিছুতেই বনেদিআনার ছাপ।পুরু জাজিম বিছানায় নরম কম্বলের ভেতর শুয়ে টুপুল বললো, নাজমুল ভাই-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে আমাদের কপাল খুলে গেছে।

জয় বললো, আমার জানা ছিলো না এতসব বড়লোকেরা বিপ্লবীদের দল করে।

দল হয়তো করে না, দলকে সাহায্য করে।

যাই বলিস, জাহাজের চাকরির চেয়ে বিপ্লবীদের জন্য কাজ করাটা অনেক আরামের মনে হচ্ছে।

বিপদের ঝুঁকির কথা ভুলে গেছিস বুঝি? বিডিআর-এর লোকটা যদি বোমার মশলার প্যাকেটটা খুঁজে পেতো, ধরে সোজা থানায় চালান করে দিতো।

ঠিক বলেছিস। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম– হাই তুলতে তুলতে বললো জয়।

জয়ের ঘুম পাচ্ছে দেখে টুপুল আর কোনো কথা বললো না। ভাবলো, কাল এক ফাঁকে স্বপ্নর সঙ্গে দেখা করে আসবে। ওকে দেখলে নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে যাবে।

পরদিন সকাল দশটায় এলো শ্যামল। টুপুলরা ততক্ষণে নাশতা খেয়ে তৈরি হয়ে ড্রইংরুমে বসে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ছিলো। প্রতুল নটার দিকে বেরিয়ে গেছে।

অমায়িক হেসে শ্যামল জিজ্ঞেস করলো, দাদাবাবুরা আজ কোথায় যাবে?

জয় বললো, যেখানে তুমি নিয়ে যাবে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে যাবে, শিবপুরে?

কতক্ষণ লাগবে যেতে?

অফিসের সময় তো, ঘন্টা দেড়েক লাগবে।

টুপুল জানতে চাইলো–টালিগঞ্জের গলফ ক্লাব রোড এখন থেকে কত দূরে, শ্যামলদা?

পনেরো মিনিট লাগবে যেতে। ওখানে কি টুপুলদাদা?

আমার এক বন্ধু থাকে। ওর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

ঠিক আছে। আগে তাহলে টালিগঞ্জই চলো।

শ্যামল পনেরো মিনিট বলেছিলো, গলফ ক্লাব রোড যেতে পঁচিশ মিনিট লাগলো। হাজরা রোডের মোড়ে একটা ট্রামের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ট্রাফিকজ্যাম লেগে গেছে। শ্যামল বিরক্ত হয়ে বললো, এই ট্রামগুলো না তুললে কলকাতাকে ভদ্র করা যাবে না।

টুপুল বললো, আমার তো ট্রাম দেখতে মজাই লাগে।

জয় বললো, স্বপ্নার টেলিফোন নম্বরটা আনলে পারতি। ফোন করে জানা যেতো বাড়িতে আছে কি না।

টুপুল মুখ টিপে হেসে নিচু গলায় বললো, যেন কলকাতা আসার প্ল্যান করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

জয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, তবু ভালো, বাড়ির নম্বরটা তোর মনে আছে।

তিরিশ নম্বর গলফ ক্লাব রোড খুঁজে বের করতে ওদের কোনো অসুবিধে হলো না। পুরোনো ধাঁচের একতলা বাড়ি। সামনে এক চিলতে বাগান। বুড়ো এক মালি বাগানে কাজ করেছিলো। গাড়ি থেকে নেমে টুপুল ওকে জিজ্ঞেস করলো, স্বপ্ন আছে?

মলি টুপুল আর জয়কে ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখলো। পেছনে ওদের গাড়ি দেখলো। মাথা নেড়ে আছে বলে ভেতরে চলে গেলো।

একটু পরেই স্বপ্ন বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। টুপুলের মনে হলো, ছবির চেয়ে অনেক ফর্সা দেখতে, ওদের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক ছোট, ছবিতে চোখে চশমা ছিলো না।

চশমা পরা স্বপ্ন একটু অবাক হয়ে দরজা খুললো। ওর চেহারা দেখে মনে হলো চিনতে পারে নি। টুপুল মৃদু হেসে বললো, তুমি চশমা লাগালেও আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনেছি স্বপ্ন।

তুমি টুপুল না? ছুটে এসে ওর সঙ্গে হাত মেলালো স্বপ্ন। কলকাতা কবে এলে?

কাল এসছি। স্বপ্নার উচ্ছ্বাসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে টুপুল বললো, এ আমার বন্ধু জয়। ভালো নাম জয়ন্ত কুমার সরকার।

গ্ল্যাড টু মিট ইউ। টুপুলের বন্ধু আমারও বন্ধু, বলে জয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে টুপুলকে প্রশ্ন করলোকলকাতায় উঠেছো কোথায়? কদ্দিন থাকবে? এসো, ভেতরে এসো আগে। এই বলে স্বপ্ন ওদের দুজনকে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালো।

স্বপ্নাকে যে রকম ভেবেছিলো, বাস্তবে ওকে আরো বেশি আন্তরিক মনে হলো টুপুলের। বললো, এখানে উঠেছি আমাদের এক বড় ভাইয়ের বন্ধু প্রতুলদার বাড়িতে। থাকবো চারদিন।

মাত্র চারদিন। স্বপ্না শুনে হতাশ হলো–ভাইয়ের বন্ধুর বাড়িতে থাকবে কেন, আমার এখানে চলে এসো। মা-বাবা খুব খুশি হবেন তোমাদের দেখলে।

ওরা কোথায় গেছেন?

আমাকে বাড়ি পাহারায় রেখে কৃষ্ণনগর গেছেন দিদিকে দেখতে। দিদির ছেলে হয়েছে। বাবা-মা কাল ফিরবেন। তোমরা আজই এখানে চলে এসো।

টুপুল মৃদু হেসে বললো, এবার ওখানেই থাকি স্বপ্ন। প্রতুলদা শুনলে মন খারাপ করবেন। পরের বার তোমাদের বাড়িতে উঠবো।

কথা দিচ্ছো তো? জয় তুমি সাক্ষী।

কথা দিলাম। হেসে বললো টুপুল।

এবার বলো, কলকাতায় কী প্রোগ্রাম? একদিন কলকাতায় থাকবে, না বাইরের কোথাও যাবে?

আছি মাত্র তিনদিন। এর ভেতর বাইরে আর কোথায় যাবো!

তাই তো! ভাবছিলাম সময় থাকলে দীঘা থেকে ঘুরে আসা যেতো। সমুদ্রের তীরে চমৎকার জায়গা।

পরের বার যাওয়া যাবে। এই বেলা আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখবো বলে বেরিয়েছিলাম। তুমি যাবে?

নিশ্চয়ই যাবো। এক্ষুণি যাবে? চা-টা খাবে না? নাকি চাও পরের বার এসে খাবে?

স্বপ্নার কথায় টুপুল আর জয় একসঙ্গে হেসে উঠলো। টুপুল বললো, শুধু চা খেতে পারি, টা নয়। গাড়িতে শ্যামলদা আছে, ডাকবো ওকে?

নিশ্চয়ই ডাকবে। আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর তৈরি হয়ে আসছি।

জয় উঠে শ্যামলকে ডাকতে গেলো। দরজায় নেমপ্লেট–এ জাস্টিস আর. মিত্র নাম দেখে শ্যামল ইতস্তত করছিলো–আমি গাড়িতে বেশ আছি। তোমরা গল্প কর না।

স্বপ্না বলেছে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। এই বলে জয় ওর হাত ধরে ড্রইংরুমে নিয়ে এলো।

শ্যামল একটু জড়সড় হয়ে তাকিয়ে দেখলো চারপাশে। টুপুল আর জয় ওর সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছে, তার মানে এই নয় যে হাইকোর্টের একজন জাস্টিসের মেয়েও ওর মতো একজন ড্রাইভারকে এতটা প্রশ্রয় দেবে।

পাঁচ মিনিট পর একজন বেয়ারা চার কাপ চা আর এক প্লেট কচুরি দিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নাও ঝলমলে পোশাক পরে ঘরে ঢুকলো। টুপুল মুগ্ধ হয়ে বললো, তোমাকে বোম্বের ছবির হিরোইনদের মত লাগছে স্বপ্না।

স্বপ্না লাজুক হেসে বললো, থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট। কই শুরু করো। শ্যামলদা, তুমিও নাও।

স্বপ্নার এক কথাতেই ওর সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেলো শ্যামলের। খুশিতে ও দুটো কচুরি খেয়ে ফেললো। স্বপ্না টুপুল, আর জয় অবশ্য শুধু চা খেলো। চা শেষ করে শ্যামল বললো, চলো ওঠা যাক।

স্বপ্না জানতে চাইল–দুটোর মধ্যে ফেরা যাবে তো শ্যামলদা? বাড়িতে বলে দিয়েছি ফিরে এসে লাঞ্চ করবো।

শ্যামল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টুপুল আর জয়কে দেখলো। টুপুলের চোখের ইশারা পেয়ে নিরীহ গলায় বললো, দাদাবাবুরা ঠিক করেছে আজ দুপুরে মাদ্রাজী খাবার চোখ দেখবে।

তাই বুঝি! তাহলে কি লাঞ্চটাও পরের বার হবে?

ঠিক ধরেছো। গলা খুলে হাসলো টুপুল আর জয়।

গাড়িতে উঠতে উঠতে স্বপ্না বললো, মা এলে টের পাবে পরের বার বলার মজা।

টুপুল বললো, আজ লাঞ্চ খাওয়ার সময় হবে না বলে এ কথা তো বলিনি, রাতে খেতে অসুবিধা আছে!

ঠিক আছে।হেসে বললো স্বপ্না, কথার যেন নড়চড় না হয়।

জয় শ্যামলের পাশে বসলো। টুপুল আর স্বপ্না বসলো পেছনে। গাড়ি ছাড়তেই স্বপ্নার সঙ্গে ওদের পুরোনো সব চিঠির প্রসঙ্গ নিয়ে গল্পে ডুবে গেলো টুপুল। জয়ের অভিমান হলো নতুন বান্ধবী পেয়ে

টুপুল ওকে পাত্তা দিচ্ছে না বলে। ভাবলো, কলকাতায় ওর যদি একটা পত্রবন্ধু থাকতো তাহলে ঠিক ওর কাছে চলে যেতো।

বারোটার দিকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে গাড়ি থামালো শ্যামল। টুপুলরা লক্ষ্য না করলেও ওর চোখে পড়েছে লাল একটা মারুতি ওদের অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে। কয়েকবারই কৌশলে রাস্তা পাল্টে শ্যামল পরখ করে দেখেছে খসানো যায় কিনা না। না পেরে বলতে বাধ্য হয়েছে, পেছনের লাল মারুতিটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।

টুপুল ঝট করে একবার পেছনটা দেখে নিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলে–কেন, কি হয়েছে?

হাওড়া ব্রিজ ক্রস করার পর থেকে ফলো করছে।

তুমি কি ঠিক জানো আমাদেরই ফলো করছে?

কয়েকবার খসাতে চাইলুম। পারলুম না।

তুমি যেভাবে চালাচ্ছ সেভাবে চালিয়ে যাও। পেছনের গাড়িতে ওরা দুজন। আমরা চারজন। বোটানিক্যাল গার্ডেনে জায়গা মতো গাড়ি থামাবে।

জয় চাপা গলায় বললো, ওদের কাছে যদি আর্মস থাকে?

হিন্দি সিনেমা দেখে তোর মাথা পচে গেছে। আমরা কি কোটিপতি বাপের ছেলে যে আমাদের কিডন্যাপ করবে?

ফলো যখন করছে, মতলব নিশ্চয় ভালো নয়। জয়ের ভয়কে উড়িয়ে দিতে চাইলো না স্বপ্না।

ফলো করার ব্যাপারটা শ্যামলদার বোঝার ভুল হতে পারে।

শ্যামল বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢোকার ফটকে গাড়ি থামালো। টুপুল সবার আগে। নামলো। তারপর জয়। ধুলো উড়িয়ে লাল মারুতিটা ওদের পাশ দিয়ে স্পীড এতটুকুনা কমিয়ে চলে গেলো। টুপুল হেসে বললো, দেখলে তো শ্যামলদা, তোমার ধারণা যে ঠিক নয়!

নিজের ধারণা সম্পর্কে শ্যামলের যথেষ্ট আস্থা আছে। খবরটা জায়গা মতো পৌঁছাতে হবে। টুপুলের কথার জবাব না দিয়ে চিন্তিত মনে ও বোটানিক্যালে ঢুকলো।

.

০৭.

তুই ঠিক বলছিস তো শ্যামল? দেখতে ভুল হয় নি তো?

শ্যামলের আশঙ্কার কথা শুনে প্রতুল হাতে ধরা মদের গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেলো। ওর বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল অবিচল গলায় বললো, এতটুকু ভুল হয় নি দাদাবাবু। আমি হলফ করে বলতে পারি ওটা আগরওয়ালাদের গাড়ি। ওদের ড্রাইভার শিউনন্দনকে আমি ভালোভাবে চিনি।

আগরওয়ালার সাহস এত বেড়েছে? আপনমনে কথাটা বলে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো প্রতুল।

দুপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে কিড স্ট্রীটের বিখ্যাত এক মাদ্রাজী রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে টুপুলরা মেট্রোতে দারুণ এক মজার ছবি হোম অ্যালোনে দেখেছে। তারপর স্বপ্না ওদের জোর করে বাড়িতে এনেছে গল্প করবে বলে। ঢাকার গল্প শোনার ভারি শখ ওর। নাকি ওদের আদিবাড়ি ছিলো বিক্রমপুরে।

টুপুলরা রাতের খাবার স্বপ্নাদের বাড়িতে খাবে। শ্যামল চলে এসেছে। বলেছে দশটায় এসে ওদের নিয়ে যাবে। গাড়ির ঘটনাটা প্রতুলকে জানাবার জন্য ও দুপুর থেকে ছটফট করছিলো।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কি যেন ভাবলো প্রতুল। তারপর শ্যামলকে বললো, ছোঁড়া দুটো কি কিছু সন্দ করেছে?

না দাদাবাবু। উল্টে বললো, আমারই দেখার ভুল।

ভালো হয়েছে। ও দুটোকে আনতে যাবি কখন?

দশটায় যেতে বলেছে।

তুই তাহলে জানকিরামের বাড়ি চলে যা। ফোন করবো না, পাজিগুলো হয়তো ফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থাও করেছে। জানকিরামকে বলবি তোর সঙ্গে এক্ষুণি চলে আসতে।

গতরাতে যে লোকটার সঙ্গে প্রতুল বসে মদ খাচ্ছিলো সে-ই জানকিরাম। নাজমুলের মতো আরেক পার্টনার। ওর বাড়ি ওয়েলেসলি স্ট্রীটে। ঠিক পঁচিশ মিনিট লাগলো ওর আসতে।

এতনা জরুরি এত্তেলা কেনো প্রতুল বাবু? কুছ গরবড় হয় নাই তো? সোফায় বসতে বসতে জানতে চাইলো জানকিরাম।

আগরওয়ালারা ছোঁড়া দুটোর পেছনে কেন লেগেছে আমাকে জানতে হবে। কি চায় ওরা? এই বলে প্রতুল গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দিলো জানকিরামের দিকে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানকিরাম শান্ত গলায় বললো, আজ সকালে হরিপ্রসাদ আগরওয়ালার সাথে আমার কথা হয়েছে। ওর মেজাজ খুব খারাপ আছে। বললো, এটা ওদের পুরানা সার্কিট। এখানে ধান্ধা করতে হলে ওদের কমিশন দিতে হবে। আমি বোলোম মাল এসেছে সাড়ে সাত লাখ ডলারের। পাঁচ লাখ দিতে

হবে ঢাকার পার্টিকে। বিজেপি-র ফান্ডে দো লাখ, থাকে পঁচাস হাজার।এর থেকে কমিশন আর কত হবে?

আগরওয়ালা কি বললো?

বললো নাফা পঁচাস হাজার হোক আর পঁচাস লাখ হোক ওদের সাড়ে তিন পারসেন্ট দিতে হবে।

বিজেপি-র হাইকমান্ড যদি জানে, ও এখানে ব্যবসা করতে পারবে?

ও জানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিজেপি কখনো সুবিধে করতে পারবে না। তাই ও এখন কংগ্রেসের সাথেও লিঙ্ক রাখছে।

ভালো, বিদ্রূপ করে হাসলো প্রতুল–বিজেপির পেছনে লাগতে যাওয়ার মজা ওকে ভালো মতোই টের পাওয়াবো।

ও কিন্তু বিজেপি হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। বোললো, আগলা মাহিনা ওর সাথে দিল্লীতে আদভানিজির মোলাকাত হোবে।

বিজেপি-র নেতা আদভানির কথা শুনে প্রতুল একটু গুটিয়ে গেলো। এখনো হাইকমান্ড পর্যন্ত ও পৌঁছতে পারেনি। চিন্তিত গলায় বললো, সত্যি সত্যি যোগাযোগ আছে, না গপ্পো দিয়েছে?

পাতা লাগাতে হোবে। এখুনি বোলতে পারছি না।

বাংলাদেশের ছোঁড়া দুটোর পেছনে লেগেছে কেন?

হোতে পারে ঢাকার সাথে ও ডাইরেক্ট কন্ট্রাক্ট করতে চায়। বাংলাদেশের কন্ট্রাক্ট আর কিভাবে পাবে?

ছোঁড়া দুটো এর বিন্দুবিসর্গ জানে না। আপনমনে বললো প্রতুল।

জানকিরাম কিছুক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপচাপ গ্লাস খালি করলো। প্রতুল আবার ওর গ্লাস ভরে দিলো। আগরওয়ালার ব্যাপারে ওরা দুজনই চিন্তিত ছিলো। এতকাল বাংলাদেশের পার্টির সঙ্গে হেরোইনের ব্যবসাটা নির্বিঘ্নেই চলছিলো। কিছুদিন আগে ওদের দলের দুজন নেতা এসে দিল্লীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে গেছে। দিল্লীর নেতারা জানে বাংলাদেশে ওরা ক্ষমতায় যেতে পারলে দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানিয়ে ফেলবে। হিন্দুদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। বিজেপি-র এতে খুব লাভ হবে। তারাও একইভাবে মুসলমানগুলোকে তাড়াবার অজুহাত পাবে। বাইরে এরা দুপক্ষই ভান করে একদল আরেক দলকে দুচোখে দেখতে পারে না, গোপনে ওরা ঠিকই হরিহর একাত্মা।

ওদের দুজনকে নিয়ে কারা কি চক্রান্ত করছে টুপুল আর জয়ের তা জানার কথা নয়। স্বপ্নাদের বাড়িতে ভিসিআর–এ এক ওয়েস্টার্ন ছবি দেখতে দেখতে ওরা জমিয়ে গল্প করছিলো। নটার সময় ছবি দেখা

শেষ হলো, আর্দালি বিলেতি কায়দায় ডাইনিং রুমে ঘন্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিলো টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে।

ডাইনিং রুমে ঢুকে খাবার টেবিলে আয়োজন দেখে আঁতকে উঠলো টুপুল-এত খাবার কে খাবে? আমাদের কি রাক্ষস ভেবেছো?

লাজুক হেসে স্বপ্না বললো, তোমরা কি পছন্দ কর জানি না তো। তাই দুপুরে বলে গিয়েছিলাম মাছ, মাংস, সজি সবই রান্না করতে।

খেতে বসে টুপুল আর জয় দুজনেরই মনে হলো এত ভালো খাবার ওরা জীবনেও চোখে দেখেনি। বাড়ির অবস্থা ওদের কারোই ভালো নয়। জয়দের অবস্থা টুপুলদের চেয়েও খারাপ। এতগুলো ভাইবোনের সংসারে অভাব লেগেই আছে। ভাবলো, ফিরে গিয়ে নাজমুলকে চাকরির ব্যাপারে বলতে হবে। বিপ্লবীদের সাহায্য করার সময় পরেও পাওয়া যাবে। আপাতত কিছুদিন চাকরি করে বাবার ঘাড়ের ভারি বোঝাটা হালকা করা দরকার।

খেতে বসেও স্বপ্নার গল্প আর ফুরোয় না। ওদের কার কি ভালো লাগে, ভবিষ্যতে কে কি হবে সবই জানা হয়ে গেছে। স্বপ্না গত বছর আমেরিকা গিয়েছিলো ওর বড় ভাই-র কাছে। সেসব গল্পও বলা হয়ে গেছে। খেয়ে উঠতে উঠতে সাড়ে নটা বেড়ে গেলো।

ড্রইংরুমে বসে স্বপ্না বললো, মাইকেল জ্যাকসনের নতুন প্রোগ্রামটা দেখ, গত বছর এনেছি।

মাইকেল জ্যাকসন ওদের ভালো না লাগলেও স্বপ্নার উৎসাহ দেখে আপত্তি করলো না। পাঁচ মিনিটও দেখা হয় নি, তখনই বাইরে গাড়ির হর্ন বাজলো।

একটু পরে আর্দালি এসে বললো, টুপুল বাবুদের গাড়ি এসেছে। স্বপ্না অবাক হয়ে বললো, কি ব্যাপার, তোমাদের গাড়ি তত দশটায় আসার কথা।

টুপুল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, কি জানি, শ্যামলদা বোধহয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়।

ওরা তিনজন বাইরে এসে দেখলো, গাড়ি ওদের সাদা অ্যাম্বাসাডারই তবে ড্রাইভার শ্যামল নয়, ওর বয়সী আরেকজন।

৬০

টুপুলদের বেরোতে দেখে ড্রাইভার নেমে এসে বললো, শ্যামলকে দাদাবাবু জরুরি কাজে এক জায়গায় পাঠিয়েছেন। আমি অফিসের ড্রাইভার। দাদাবাবু বলেছেন আপনাদের যেন নিয়ে যাই।

তাড়াতাড়ি গাড়ি আসাটা স্বপ্নার মোটেও ভালো লাগেনি। বললো, শ্যামলদাকে তো বলা হয়েছিল দশটায় আসতে।

ড্রাইভার কুণ্ঠিত গলায় বললো, শ্যামল আমাকেও তাই বলেছিলো। দশটায় আবার দাদাবাবুকে তুলতে হবে গড়িয়া থেকে, তাই একটু আগে এসে গেলাম।

টুপুল বললো, ঠিক আছে স্বপ্না। আজ বরং যাই। কাল সকালে ফোনে কথা বলবো। আমাদের নম্বর তো রইলো।

স্বপ্না বললো, রাতেও ফোন করতে পারি। টুপুল হেসে বললো, অসুবিধা নেই। আমাদের বেডরুমে টেলিফোনের এক্সটেনশন আছে।

স্বপ্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে টুপুল আর জয় গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করলো। টুপুল হঠাৎ খেয়াল করলো, কাল থেকে যে গাড়িতে ওরা চলাফেরা করছে এটা সেই গাড়ি নয়। ভাবলো, প্রতুলদা যেরকম বড়লোক কয়েকটা গাড়ি থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

টুপুলরা কলকাতার রাস্তাঘাট কিছু চেনে না বলে বুঝতে পারলো যে না ওরা গড়িয়ার দিকে না গিয়ে আনোয়ার শাহ রোডে ঢুকেছে। ড্রাইভারও জানে তার কিশোর যাত্রীদের পক্ষ থেকে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত মনে গাড়ি চালিয়ে নির্বিঘ্নে এসে ঢুকলো উঁচু পাঁচিলঘেরা এক এক দুর্ভেদ্য বাড়ির ভেতর।

দোতলার ঝুলবারান্দার নিচে গাড়ি রেখে ড্রাইভার পেছনের দরজা খুলে ওদের ডাকলো,–দাদাবাবুরা আসুন, প্রতুল দাদাবাবু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

টুপুলদের ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি তারা শত্রুপুরিতে আটকা পড়ে যাচ্ছে। তারা নিশ্চিন্তমনে ড্রাইভারকে অনুসরণ করে ভেতরে ড্রইংরুমে গিয়ে বসলো। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো গৃহস্বামীর অবস্থা প্রতুলদের চেয়ে ভালো বৈ খারাপ নয়। আসবাবপত্র, জানালার পর্দা সবকিছু সুভদ্রা ভিলার চেয়ে অনেক দামী। দেয়ালে পুরোনো দিনের দুর্লভ পেইন্টিং, শোকেসে এন্টিক, মেঝেতে পুরু কার্পেটের ওপর খানতিনেক রয়েল বেঙ্গলের মুওয়ালা চামড়া বিছানো–সব মিলিয়ে এক রাজকীয় পরিবেশ।

যে সোফায় ওরা বসেছিলো তার গদিগুলো এত নরম যে ওদের মনে হচ্ছিলো একতাল মাখনের ভেতর ডুবে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবক ঘরে ঢুকলো। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, ওপরে দামী কাশ্মিরী শাল, মুখে মোটা চুরুট, চুলগুলো কদমছাট, ফরসা ভারিক্কি চেহারা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। গম্ভীর মুখে বললো, তোমরা তাহলে বাংলাদেশ থেকে এসেছো?

জেরার ধরণটা ভালো না লাগলেও টুপুল গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো। আমার নাম হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা। তিনপুরুষ ধরে কলকাতায় আছি। তোমরা তো একেবারে বাচ্চা মনে হচ্ছে। এ লাইনে কদ্দিন ধরে আছো?

এ লাইন মানে কি? অবাক হয়ে টুপুল বললো, প্রতুলদা কোথায়?

প্রতুল বাবুকে এখানে পাবে না। আমি তোমাদের এনেছি কিছু কথা জানবার জন্য।

তার মানে? টুপুল রেগে গিয়ে বললো, আপনি আমাদের মিথ্যে কথা বলে ধরে এনেছেন? আপনার কোনো কথার জবাব দেবো না। আমরা এক্ষুণি প্রতুলদার কাছে যাবো।

টুপুল আর জয় যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। হরিপ্রসাদ ঠাণ্ডা গলায় বললো, আমার কথার জবাব না দিয়ে এখান থেকে এক পা নড়লে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

চমকে উঠে ওরা চারপাশে তাকিয়ে দেখলো ঘরের দরজার কাছে দুজন ওদের দিকে স্টেনগান তাক করে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত টুপুল আর জয়ও ওদের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হরিপ্রসাদের ঠোঁটে হাসির রেখা। কয়েকবার মাথা নাড়লো। টুপুল ধপ করে আবার সোফায় বসলো। ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলো, আপনি আসলে কে?

নাম তো বলেছি। হরিপ্রসাদের ঠোঁটের ফাঁকের বাঁকা হাসি আরও স্পষ্ট হলো–তোমরা যে ধান্ধায় আছে, আমিও একই ধান্ধায় আছি।

ধান্ধা মানে কি? আমরা কি ধান্ধা করছি?

তোমরা ড্রাগস-এর ব্যবসা করছো! বাংলাদেশে থেকে হেরোইন এনে প্রতুলকে দিয়েছে ইউরোপে পাচার করার জন্য।

হরিপ্রসাদের কথা শুনে টুপুল আর জয়ের শরীরে যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। অসহায় গলায় জয় বললো, আপনি এসব কি আবোল-তাবোল বলছেন? আমরা কক্ষনো এমন নোংরা কাজ করতে পারি না!

পেরেছো। ঠাণ্ডা গলায় হরিপ্রসাদ বললো, তোমরা খুবই সাকসেসফুলি তোমাদের দায়িত্ব পালন করেছে। নাও, ধানাই-পানাই রেখে কাজের কথায় এসো।

তোমাদের দিয়ে আমি নাজমুলের কাছে একটা প্রপোজাল পাঠাতে চাই। প্রতুল আমাকে যে কমিশন দেবে সেটা আমি নাজমুলকে দেবো। মালটা আমার হাতে আসতে হবে। পেমেন্ট হবে ডলারে।

হরিপ্রসাদের কথায় একেবারে ভেঙে পড়লো টুপুল-ফির গড সেক, আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করুন। আমরা এসব হেরোইনের বিন্দুবিসর্গ জানি না।

মিথ্যে বলছো। হরিপ্রসাদের গলায় উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নেই–তোমরা কি ঢাকা থেকে হেরোইনের দুটো প্যাকেট এনে প্রতুল সাহাকে দাওনি? তোমরা কি নাজমুলের গ্রুপের হয়ে কাজ করছে না?

হরিপ্রসাদের কথা শুনে টুপুল আর জয় দুজনই গভীর সমুদ্রে পড়ে গিয়ে খাবি খেতে লাগলো। নাজমুল বলেছে সংগঠন এবং তৎপরতা সবই গোপন রাখতে। অথচ এখন অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে সত্যি কথা না বললে ওদের হেরোইন ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এর চেয়ে নোংরা ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে পুরো পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলো ওরা। একটু ইতস্তত করে টুপুল বললো, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। তবু বলছি, আপনার ধারণা ঠিক নয়। এইটুকু ভূমিকা করে টুপুল ওদের বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে কিভাবে ওরা কলকাতা এসেছে সব কথা হরিপ্রসাদকে খুলে বললো।

টুপুলের কথা শুনতে শুনতেই হরিপ্রসাদের কপালে ভাঁজ পড়লো। ওর কথা শেষ হওয়ার পর কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনোটাই করছি না। তবে তোমাদের কথা যদি সত্যিও হয় এটুকু বলতে পারি যে তোমরা যেখানে নেমেছে সেখান থেকে পেছনে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। তোমাদের নসিব জড়িয়ে গেছে নাজমুলের কারবারের সঙ্গে। আমিও একই ধান্ধা করি বলে বলতে পারি এই পরিস্থিতি যদি তোমরা মেনে নাও তবেই প্রাণে বাঁচতে পারবে।

–এই বলে হরিপ্রসাদ হাসলো। ভয় পাওয়া ছেলে দুটোর চেহারা ভালো করে জরিপ করলো, আমি তদন্ত করে দেখতে চাই তোমরা কতটুকু সত্যি কথা বলেছে। আপাতত তোমরা এখানেই থাকবে।

আমাদের আপনি বন্দী করে রাখবেন? প্রশ্ন করলো জয়।

ঠিক বন্দী নয়। বাড়ির ভেতরে থাকবে। টিভি দেখ, ভিসিআর দেখ, গেমস আছে–খেলতেও পারো। শুধু বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না।

আমাদের জামাকাপড় সব প্রতুলদের বাড়িতে।

এখানে ওসবের অভাব হবে না।

জয় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, আপনি আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা দেশে ফিরে যাবো।

তার কোনো উপায় নেই। নাজমুলের কন্টাক্ট আমার চাই। সেটা একমাত্র তোমরাই করে দিতে পারো। প্রতুল জানতে পারলে তোমাদের খুন করবে। আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই থাকতে বলছি। এই বলে হরিপ্রসাদ গলা তুলে ডাকলোতেওয়ারি।

বোলিয়ে সরকার। মাঝবয়সী এক আর্দালি ঘরে ঢুকলো।

ইনলোগকো গেস্টরুম দিখাও। কোই তকলিফ না হোনা চাহিয়ে। পান্ডে আওর লছমন কো বোলো মুঝসে মিলনে।

তেওয়ারি ওদেরকে চলিয়ে বাবুজি বলে ভেতরে গেস্টরুমে নিয়ে গেলো। প্রতুলের চেয়ে হরিপ্রসাদ যে অনেক বেশি ধনী এ ঘরে এসেও ওরা টের পেলো। তেওয়ারী ওদের বাথরুম আর ওয়ার্ডরোব দেখিয়ে চলে গেলো। ওয়ার্ডরোবে স্লিপিং স্যুট থেকে শুরু করে নতুন প্যান্ট শার্ট সবই আছে। ঘরের এক কোণে রঙিন টিভি, ভিসিআর প্রচুর ক্যাসেটসহ আরাম আর প্রাচুর্যের বহু উপকরণ রয়েছে এখানে সেখানে। ওসব কিছুই টুপুল আর জয়ের মন স্পর্শ করলো না। হতভম্ব হয়ে ওরা ভাবছিলো হরিপ্রসাদ যা বলেছে তা কি সত্যি? ওরা কি সত্যি সত্যি হেরোইন চোরাচালানিদের খপ্পরে পড়েছে?

যেভাবেই হোক আগরওয়ালাদের খপ্পর থেকে ছোঁড়া দুটোকে উদ্ধার করতে হবে। শক্ত গলায় কথাটা বললো প্রতুল সাহা।

ওর পাশে চিন্তিত মুখে বসে আছে জানকিরাম। রাত তখন সাড়ে দশটা। সন্ধ্যায় সুভদ্রা ভিলায় আসার পর থেকে জানকিরাম সমানে মদ খাচ্ছে। নাকি বেশি খেলে ওর মাথা খোলে। স্বপ্নাদের বাড়িতে শ্যামল ঠিক দশটায় গিয়ে যে খবর শুনেছে তাতে ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিলো। স্বপ্না উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, একটু আগে প্রতুলদা ওদের নেয়ার জন্যে গাড়ি পাঠান নি? নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে কাষ্ঠ হেসে শ্যামল বলেছে। তাহলে দাদাবাবুই কেদারকে পাঠিয়েছেন। আমি অন্য এক কাজে গিয়ে আটকে গিয়েছিলুম। ভাবলুম যদি কেদার না এসে থাকে–এদিকটা হয়েই যাই।

ঠিক আছে। কাল ওদের পৌঁছে দেবো। নিজেকে স্বপ্নার জেরা থেকে উদ্ধার করে শ্যামল কোনো রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। আগরওয়ালাই যে টুপুলদের অপহরণ করেছে এটা বুঝতে ওর এতটুকু অসুবধে হয়নি। তবে কথাটা অন্য কেউ জানলেই পুলিস এসে নাক গলাবে। এটা প্রতুল কখনো পছন্দ করবে না।

শ্যামলের ধারণার সঙ্গে প্রতুল একমত হলো। জানকিরাম বললো, ছোকরা দুটার জান খতরেমে আছে। ওরা যদি সাচ বাত না বাতায় হরিপ্রসাদ ওদের খুন করবে।

কি সাচ বাত বলবে? ওরা কিছু জানে যে বলতে যাবে?

নাজমুলের কাছে কিভাবে পঁহুছাতে হোবে এ বাত তারা জরুর জানে।

তাতে কি হলো? হাইকমান্ডের হুকুম ছাড়া নাজমুল অন্য কারো সঙ্গে লেনদেন করতে পারবে না।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেনো দিল্লীর হাইকমান্ডের সাথে আগরওয়ালাদের জানপহেচান আছে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো প্রতুল। জানকিরামও কোনো কথা না বলে মদ গিলতে লাগলো। রাত সোয়া এগারোটায় হরিপ্রসাদের ফোন এলো প্রতুলের কাছে। ভূমিকা না করে হরিপ্রসাদ বললো, ছেলে দুটোর জন্য আপনি পেরেশান হবেন না। ওরা আমার হেফাজতে ভালো থাকবে। আপনি আমাদের কমিশন দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি জানি মাল পুরা তিন কেজি আছে।

বলেছে বুঝি ওই হারামজাদা দুটো–রাগ চেপে রাখতে পারলো না প্রতুল।

ওরা যা জানে আপনি তাও জানেন না? উপহাসের গলায় হরিপ্রসাদ বলল, ওরা ছাড়াও আমার বহু সোর্স আছে যা আপনার নেই।

ছোঁড়া দুটোকে ফেরত পাঠালে আমি আপনার কমিশন পাঠিয়ে দেবো।

ওদের না পাঠালে কি হয়?

নাজমুল আমাকে বেঈমান ভাববে। আমাদের চুক্তি সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই ভালোভাবে জানেন।

জানি। আমরা চাই নতুন করে আমাদের সঙ্গে চুক্তি হোক।

হরিপ্রসাদজী, এটা আপনি কক্ষণো করতে পারেন না। আমাদের কারবারের কতগুলো নিয়ম আছে।

নিয়ম আপনি ভেঙেছেন আমার সারকিটে ঢুকে।

ছোঁড়া দুটোকে আপনি তাহলে ফেরত দেবেন না?

কমিশন আগে পাঠান, ভেবে দেখি।

ঠিক আছে–বলে খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো প্রতুল। শক্ত গলায় জানকিরামকে বললো, বিহারীলালকে খবর দাও আজ রাতেই। আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভেতর ছেঁড়া দুটোকে খুন করতে হবে। আমি চাই না হরিপ্রসাদ কোনো অবস্থায় ঢাকার কন্টাক্ট পাক।

.

০৮.

স্বপ্নাকে সাতপাঁচ বুঝিয়ে সুভদ্রা ভিলা যেতে যেতে শ্যামল মনে মনে নিজের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করছিলো ওর ধারনা ছিলো পরদিন সকালে টুপুলরা যোগাযোগ না করলে স্বপ্না ওদের খোঁজ নিতে

পারে যদি ওর কাছে সুভদ্রা ভিলার ঠিকানা বা ফোন নম্বর থাকে। শ্যামল চলে যাওয়ার পর স্বপ্নার মনের ভেতর এক ধরনের অস্বস্তি আর সন্দেহ দানা বাঁধছিলো। দুই ড্রাইভারের কথা কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে। শ্যামল না এলে এ নিয়ে ভাববার কিছু ছিলো না। টুপুলরা চলে গেছে শুনে শ্যামলের মুখে ক্ষণিকের জন্য ভাবান্তর হয়েছিলো, সেটা স্বপ্নার নজর এড়ায় নি।

বিছানায় শুয়ে ওর প্রিয় হার্ডি সিক্স-এর নতুন বইটা পড়তে গিয়ে স্বপ্না কিছুতেই মন বসাতে পারলো না। ওদের বসার ঘরের গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকে যখন বারোটার ঘন্টা বাজলো তখন উঠে গিয়ে সুভদ্রা ভিলার নম্বরে ডায়াল করলো। টুপুলকে ও বলেছিলো রাতে ফোন করতে পারে।

তিনবার রিং হওয়ার পর প্রতুল রিসিভার তুললো। অপর প্রান্ত থেকে স্বপ্না বললো, আমি টুপুলের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

আপনি কে? অবাক হয়ে জানতে চাইলে প্রতুল।

আমি ওর বন্ধু স্বপ্না।

টুপুল নেই। শান্ত গলায় বললো প্রতুল।

সে কি! টুপুল আর জয় এখনো বাড়ি ফেরে নি?

ফিরেছে। তারপর আবার দাদাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে।

কোথায় গেছে? কখন ফিরবে?

দাদাবাবুদের বাগানবাড়ি গেছে দমদমে, পরশু ফিরতে পারে।

ওরা যে বললো, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে আসবে?

আসতে পারে। আবার যদি দাদাবাবুর সঙ্গে শিকারে যায় নাও আসতে পারে।

আপনি কে?

এ বাড়িতে কাজ করি–বলে রিসিভার রেখে দিলো প্রতুল। বিরক্ত হয়ে মনে মনে বললো, বজ্জাত ঘোড়াগুলো আসতে না আসতেই বন্ধু জুটিয়ে বসে আছে।

মিনিট দশেক আগে প্রতুলের কাছে জানকিরামের ফোন এসেছিলো। বললো, বিহারীলাল জোড়া খুনের জন্য পুরো দুলাখ নেবে। প্রতুল বলেছে, গো অ্যাহেড।

স্বপ্নার সঙ্গে কথা বলার পর প্রতুল ঠিক করলো পরের বার ফোন করলে সোজা বলে দেবে ঢাকা থেকে জরুরি খবর আসায় ওরা দেশে ফিরে গেছে।

প্রতুলের সঙ্গে কথা বলার পরও স্বপ্না নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। ঘরে গিয়ে মাথার কাছের টেবিল লাইটটা হার্ডি সিক্স পড়তে গিয়ে ভাবলো, বলেছে একদিন অপেক্ষা করতে। দেখা যাক কি হয়। এমনও তো হতে পারে কাল সকলে ওরা ঠিকই এসে হাজির হলো। এখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তখন আবার লজ্জায় পড়তে হবে।

হরিপ্রসাদের বাড়ির অবস্থা অনেকটা প্রতুলের মতোই। বাড়িতে কোনো মহিলা নেই। হরিপ্রসাদ আর লালু প্রসাদ দুই ভাই থাকে দোতালার দুপ্রান্তের দুটো কামরায়। রাতে নিচের তলায় বাইরের ঘরে আর্দালি তেওয়ারি ঘুমায়। অন্য সব কাজের লোক থাকে মূল বাড়ির একপাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। গেটে দুজন দারোয়ান থাকে সব সময়। আটঘন্টা পর পর ওদের ডিউটি বদল হয়। এ ছাড়া গোটা দুই অ্যালসেশিয়ানও রাতে ছাড়া থাকে। বাড়ির চারপাশে সারারাত চক্কর দেয় আর মাঝে মাঝে গরগর করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ও দুটোর কথা তেওয়ারি বলে গেছে টুপুলদের বাবুজিরা রাতে ভুল করেও বাড়ির বাইরে পা রাখবে না। নিকি-মিকি বহুৎ খতরনাক কুত্তা আছে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

রাত তখন আড়াইটা। বাড়ির সবাই ঘুমে ডুবে গেলেও টুপুল আর জয়ের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। সারাক্ষণ ওদের মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে–যে করেই হোক পালাতে হবে।

ঘরের ভেতরের লাইট নিভিয়ে দিয়েছিলো তেওয়ারি। করিডোরে কম পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। বাড়ির বাইরে প্রচুর আলো। বাগানে গার্ডেন লাইট ছাড়াও গেট-এর দুপাশে জোরালো মার্কারি লাইট জ্বলছে। দুই পাহারাদারের নজর এড়িয়ে একটা ছুঁচোও ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

টুপুল আর জয় পাশাপাশি দুটো সিঙ্গেল খাটে শুয়েছিলো। রাস্তায় একটা কুকুর শীতে কাঁপা নেড়ি ডাক ছাড়তেই বাড়ির ভেতর থেকে অ্যালসেশিয়ানের মৃদু গর্জন শোনা গেলো। তারপর সবকিছু চুপচাপ।

টুপুল চাপা গলায় বললো, জয় ঘুমিয়েছিস?

না। কান্না ভেজা গলায় জবাব দিলো জয়।

টুপুল লক্ষ্য করেছে জয় অল্পেই নার্ভাস হয়ে যায়। এ নিয়ে কোনো কথা না বলে আগের চেয়ে আরো আস্তে বললো, বসার ঘরে একটা টেলিফোন আছে, লক্ষ্য করেছিস?

তাতে কি?

স্বপ্নাকে টেলিফোনে পাওয়া যায় কিনা দেখি।

তেওয়ারি টের পেলে খুন করবে।

চল না গিয়ে দেখি । তুই দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিবি । কাউকে আসতে দেখলে আমাকে বলবি–পেয়েছিস?

কি পাবি তুই?

আমার কলমটা খুঁজবো সেখানে।–এই বলে নিঃশ্বব্দে উঠে বসলো টুপুল। পা টিপে টিপে খুব সাবধানে ওরা দরজা খুললো। মাথাটা সামান্য বের করে দেখলো–কোথাও কেউ পাহারা দিচ্ছে না। কোনোরকম শব্দ না করে ওরা বসার ঘরে এলো। এক টুকরো কাগজে স্বপ্না ওর ফোন নম্বর লিখে দিয়েছিলো। শোয়ার আগে বাথরুমে ঢুকে নম্বরটা মুখস্থ করে কাগজটা কমোডে ফেলে ফ্লাস ঠেলে দিয়েছে টুপুল। টেলিফোনের ওপর ছোট একটা কুশন চাপা দিয়ে ডায়াল ঘোরালো টুপুল, যাতে ডায়ালের শব্দ বাইরে না যায়। পাঁচবার রিং হওয়ার পর ওপাশে রিসিভার তুললো স্বপ্না। হ্যালো বলতেই টুপুল চাপা গলায় দ্রুত বললো, আমি টুপুল, মন দিয়ে শোনো স্বপ্না। আমাদের দুজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। একটা বাড়িতে আটকে রেখেছে।

কেন কিডন্যাপ করেছে? উত্তেজিত গলায় স্বপ্না বললো, আমি অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম যখন শ্যামল এসে আবোল-তাবোল বললো।

আমাদের নিয়ে ভয়ানক এক ষড়যন্ত্র হচ্ছে স্বপ্না।

বাড়ির ঠিকানা বা লোকেশন বলতে পারবে?

কিছুই বলতে পারবো না এ বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি যে ওরা কিডন্যাপ করেছে। এবাড়িটা তোমাদের বাড়ি থেকে গাড়িতে দশ বারো মিনিট দূরে।

কারা কিডন্যাপ করেছে? ছেলেধরা গুণ্ডা?

না, বিরাট বড়লোক। হেরোইনের ব্যবসা করে।

ওরা কেন কিডন্যাপ করলো?

বিরাট ষড়যন্ত্র। দেখা হলে বলবো।

কাল রাতে ফোন করতে পারবে?

যদি এখানে থাকি তাহলে বোধহয় পারবো।

যেভাবে তোক থাকো। দিনের বেলা চারপাশটা দেখে ফোনে লোকেশনটা আমাকে বলবে। বাড়িটাকে যেন চেনা যায়। টেলিফোনে একবার দেখো তো নম্বরটা কোথাও আছে কিনা।

বসার ঘরে কোন আলো ছিলো না। বাগানের খানিকটা আলো জানালা গলিয়ে মেঝের ওপর পড়ে ঘরের অন্ধকারটা খানিকটা ফ্যাকাসে হয়েছিলো। ভালো করে রিসিভার রাখার জায়গা আর সামনে পেছনে টেলিফোন সেট ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো টুপুল। কোথাও কোন নম্বর নেই। হতাশ হয়ে কথাটা স্বপ্নাকে জানালো।

জয় দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ওর চোখ ছিলো করিডোরের শেষ মাথায় দোতলার সিঁড়ির কাছে। হঠাৎ ওর মনে হলো দোতলায় খুট করে দরজা খোলার শব্দ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বললো, টুপুল কুইক।

রাখছি। বলে টুপুল রিসিভারটা জায়গামত রেখে জয়কে নিয়ে ছুটে এসে ওদের ঘরে ঢুকলো। তখনই শুনলো দোতলার কাঠের সিঁড়িতে স্লিপারের আওয়াজ তুলে কে নামছে। মুহূর্তের ভেতর দুজন খাটে উঠে কম্বলের তলায় ঢুকলো।

দুজনই শুয়েছিলো দরজার দিকে পিঠ করে। টের পেলো, সামান্য শব্দ করে কেউ যেন ওদের দরজা খুলছে। না তাকিয়েও ওরা বুঝতে পারলো হরিপ্রসাদ ওদের ঘরে ঢুকেছে। ওরা দুজন চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রইলো। উত্তেজনায় জয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

হরিপ্রসাদ পা টিপে ওয়ার্ডরোবের কাছে এলো। ওদের দুজনের প্যান্ট শার্ট ওয়ার্ডোবের পাশে দেয়াল আলমারিতে রাখা ছিলো। টুপুল ওর চোখের পাতা এক সুতো ফাঁক করে দেখলো হরিপ্রসাদ ওদের প্যান্ট শার্টের পকেট হাতাচ্ছে। ওর প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে একটুররা কাগজ বের করে হাতে পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো। টুপুল বুঝলো ওটা ওর ইটালীর পত্রবন্ধুর ঠিকানা। হরিপ্রসাদ সন্তুষ্ট হয়ে ঠিকানাটা ওর নিজের পকেটে রাখলো। ওর ঠোঁটে আত্মতৃপ্তির হাসি। ওর সন্দেহ যে অমূলক নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। ইটালীর ঠিকানা দেখে ওর ধারণা বদ্ধমূল হলো এদের সঙ্গে নিশ্চয় মাফিয়াদেরও যোগাযোগ আছে।

হরিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই টুপুলের দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হলো। স্বপ্নার সঙ্গে ফোনে কি কথা হয়েছে জয়কে বললো। তারপর ভাবলো কালকের দিনটা এ বাড়িতে থাকার জন্য ওরা কি কি করতে পারে। রাত তিনটার দিকে ঘুমে ওর চোখ বুজে এলো। জয় অবশ্য হরিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

সকালে ওদের দুজনের নাশতা ঘরেই দিয়ে গেলো তেওয়ারি। চারখানা করে টোস্ট, মাখন আর ডিমপোচ। নাশতা শেষ হলে দুকাপ চা নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো তেওয়ারি। বললো, চায়ে পিনে কা বাদ ছোটে সরকার সে মিলো।

তেওয়ারি বেরিয়ে যেতেই টুপুল বললো, শোন, তোর আজ পেট খারাপ। রাতে আর সকালে চার বার বাথরুমে। গেছিস। ভীষণ দুর্বল বোধ করছিস। এসব কথা হরিপ্রসাদকে বলতে হবে।

বললে কি হবে? অবাক হয়ে জানতে চাইলো জয়।

আজকের দিনটা আমাদের এ বাড়িতে থাকতে হবে। ক্রিম মেখে মুখটা অত চকচকে করেছিস কেন? বাথরুমে গিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-মুছে শুকনো শুকনো করে ফেল।

জয় বাথরুমে যেতে মনে মনে গজ গজ করলো–সবটাতেই মাতব্বরি। নিজের পেট খারাপ হতে কি ক্ষতি ছিলো? যত চোটপাট আমার ওপর! পরশু থেকে স্বপ্নার সঙ্গে টুপুলের এত মাখামাখি ওর মোটেই ভালো লাগছিলো না। যেন জয় নয়, স্বপ্নাই ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এমন হবে জানলে ও কক্ষণো টুপুলের সঙ্গে আসতো না।

বাথরুম থেকে শুকনো মুখে বেরোনোর পর টুপুল ওকে ভালো করে দেখে বললো, এবার ঠিক হয়েছে, চল।

হরিপ্রসাদ বসার ঘরে বসে সেদিনের স্টেটসম্যান পত্রিকা পড়ছিলো। ওদের ইশারায় বসতে বললো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শেয়ার বাজারের সংবাদ পড়লো। তারপর বললো, তোমরা কি ঠিক করলে? এখনো কি প্রতুল সাহার কাছে ফিরে যেতে চাও?

টুপুল ম্লানমুখে বললো, আপনি যা বলবেন তাই করবো। আমাদের দেশে ফিরে যেতে দিন।

এই তো গুড বয়ের মত কথা। আমার কাজ খুবই সামান্য। তোমাদের সঙ্গে আমার একজন লোক যাবে। ওকে শুধু নাজমুলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। বাকি কাজ ওই করবে। তারপর তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে।

কখন যেতে হবে?

আজ দুপুরের ট্রেনে। প্রতুল সাহা তোমাদের খুন করার জন্য তোক ভাড়া করেছে। যত তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারো তত ভালো।

আজ কিভাবে যাবো? মুখ কালো করে টুপুল বললো, জয় অসুস্থ, সকালে বিছানা থেকে উঠতে পারছিলো না।

কি অসুখ? বিরক্তিভরা গলায় জানতে চাইলো হরিপ্রসাদ।

ভীষণ দাস্ত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ছবার বাথরুমে গেছি। চি চি করে জয় বললো, মনে হচ্ছে কলেরা। দাঁড়ালেই মাথা ঘুরছে। হাঁটতে পারছি না।

তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়। হরিপ্রসাদ গলা তুলে তেওয়ারিকে ডাকলো।

সঙ্গে সঙ্গে জ্বী সরকার, বলে তেওয়ারি হাজির।

ডাগদর সাবকো জলদী আনে বোলো। এই বলে হরিপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে গেলো।

তেওয়ারির টেলিফোন পেয়ে পনেরো মিনিটের ভেতর কালো পেটমোটা ব্যাগ হাতে আধবুড়ো ডাক্তার এসে হাজির হলো। টুপুলরা আর ঘর থেকে বেরোয় নি।

টুপুল আর জয়কে চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে দেখে ডাক্তার ফ্যাসফ্যাসে গলায় জানতে চাইলো, কার অসুখ!

শুকনো মুখে মিন মিন করে জয় বললো, আমার।

কি অসুখ?

গত বছর জয়ের ছোট বোনের ডায়রিয়া হয়েছিলো। ওকে নিয়ে জয়কেই ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হয়েছিলো। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জয় ওর পেটের অসুখের বিবরণ দিলো।

জয়কে সোফায় শুইয়ে ওর পেট টিপে দেখলো ডাক্তার। তারপর বুক আর জিভ দেখলো। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সকালে কি খাওয়া হয়েছে?

একখানা টোস্ট আর চা।

চা-টা খাওয়া চলবে না। দুপুরে লেবু কচলে একটুখানি জল আর লবণ দিয়ে শুধু ভাত। বেশি করে স্যালাইন ওয়াটার খাবে। প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছি।

হরিপ্রসাদ ঘরে ঢুকে বিরক্ত গলায় জানতে চাইলো, কি হয়েছে ডাক্তার?

ডায়রিয়া। গুরুপাক কিছু খেয়েছিলো কাল, অনেক সময় টেনশন থেকেও হয়।

পরীক্ষার আগে আমাদেরও হতো। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো ডাক্তার।

ডাক্তারের রসিকতা হরিপ্রসাদের ভালো লাগার কথা নয়। শক্ত গলায় বললো, সারবে কখন?

একটা ওষুধ দিচ্ছি। আশা করছি আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে কাল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে।

তেওয়ারি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসক্রিপশন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হরিপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললো, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল ভোরেই রওনা হবে।

টুপুল আর জয় ঘরে এসে বিছানায় গিয়ে উঠলো। জয় মুখ টিপে হেসে বললো, তুই আবার শুতে যাচ্ছিস কেন? তোর তো পেট খারাপ হয় নি?

হতে পারে। গম্ভীর হওয়ার ভান করলো টুপুল–ডায়রিয়া রোগটা ছোঁয়াচে।

গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো জয়। টুপুলেরও ঘুম পাচ্ছিলো। ঘুমোলে চলবে না। আসল কাজ এখনো বাকি।

বারোটা নাগাদ হরিপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় ওদের ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখে গেছে জয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আর টুপুল বিছানায় শুয়ে প্রচ্ছদে অমিতাভ বচ্চনের ছবিওয়ালা আনন্দলোক পড়ছে।

যেতে যেতে হরিপ্রসাদ ভাবলো, ছেলে দুটো বেশ নিরীহ প্রকৃতির। তেমন চালাক চতুর হলে নিশ্চয় পালাবার চেষ্টা করতো। যদিও তাতে সফল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবু ছেলেদুটোর স্বভাব-চরিত্র কিছুটা বোঝা যেতো। মনে হচ্ছে ওরা দেশে ফিরতে পারলেই খুশি।

হরিপ্রসাদ অবশ্য জানে দেশে ঠিকমতো ফিরলেও নজমুলে খপ্পর থেকে ওদের মুক্তি নেই। কারণ ওর আসল পরিচয় এরা জেনে গেছে। যদি দলে থাকতে না চায় ওর গ্রুপ এদের মেরে ফেলবে। এ নিয়ে অবশ্য হরিপ্রসাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওর দরকার ছেলে দুটোকে দিয়ে নাজমুলের কাছে পৌঁছানো। ওর অফার পেলে নাজমুল যে প্রতুল সাহাদের সঙ্গে কোনো লেনদেন করবে না এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত।

হরিপ্রসাদ বেরিয়ে যাচ্ছে এটা টুপুল ঠিকই টের পেয়েছিলো। গাড়ির শব্দ গেটের বাইরে মিলিয়ে যাওয়ার পরও সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলো। সকাল থেকে লক্ষ্য করেছে, জায়গাটা বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে একটা-দুটো গাড়ির শব্দ আর ক্লান্ত ফেরিওয়ালার ডাক ছাড়া তেমন কোনো শব্দ নেই। বাড়ির চারপাশে অনেক গাছ। দুটো ঘুঘুর উদাস করা ডাক শুনেছে কিছুক্ষণ আগে। হরিপ্রসাদের বাড়ির ভেতরও লোকজনের কোনো সাড়া নেই।

জয় তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে না ডেকে টুপুল একাই উঠে বসলো। এ ঘরের দুটো বড় বড় জানালা। দুটোতেই ভারি পর্দা টানা। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একবার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল । তেওয়ারি নাশতা দিতে এসে ওদের কোনো কথা না বলে পর্দা টেনে ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ওরা বুঝে নিয়েছে পর্দা টানাই থাকবে।

খুব সাবধানে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখতে চাইলো টুপুল আশেপাশে কিছু দেখা যায় কিনা। জানালার বাইরে শুধু আকাশ আর গাছ। উঁচু দেয়ালে কিনার ঘেঁষে ঘন সবুজ দেবদারু গাছের আরো উঁচু দেয়াল। ওপাশে ঘরবাড়ি আছে কিনা বোঝার কোনো উপায় নেই। হতাশ হয়ে পাশের জানালার পর্দা সরালো। আগের মতই দৃশ্য, না, সামান্য পার্থক্য আছে। ডানপাশে দেবদারুর ফাঁক দিয়ে কিছুটা দূরে উঁচু ওভারহেড পানির ট্যাঙ্ক নজরে পড়লো, লোহার বানানো, কালো রঙ করা। কিছু না থাকার চেয়ে এটাও কম নয়।

একবার ছাদে গিয়ে দেখলে হয়! কথাটা মনে হতেই দরজা খুলে পা টিপে টিপে করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো টুপুল। ছাদে উঠলে নিশ্চয় চারপাশটা ভালোভাবে দেখা যাবে। রাস্তার কোনো দোকানের সাইনবোর্ড থেকে পাড়াটার নামও জানা যেতে পারে। উৎসাহ আর উত্তেজনায় টুপুলের বুকের ভেতর চিব ঢিব করছিলো।

দোতালায় উঠেই পাশে ছাদে ওঠার সিঁড়ি চোখে পড়লো ওর। সিঁড়ির ওপরের খোলা দরজা টুপুলকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। ছাদের সিঁড়িতে পা রাখতেই পেছনে ধমকের গলা ওর পিঠে চাবুক বসালোওদিকে কোথায় যাচ্ছো? তোমাদের ঘর থেকে বেরোতে বারণ করা হয় নি? যাও ঘরে।

কেয়ারটেকার দুবের ধমক খেয়ে টুপুল মুখ কালো করে ঘরে এসে ঢুকলো। রাতে টেলিফোনে স্বপ্নাকে কিছুই বলতে পারবে না–কথাটা মনে হতেই ওর বুকের ভেতর কান্না গুমরে উঠলো।

.

০৯.

রাত বারোটার পর থেকে স্বপ্না ওদের ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করছিলো টুপুলের টেলিফোনের জন্য। ওর হাতে ধরা হার্ডি সিক্স-এর বইটা, মন ছিলো টেলিফোনের দিকে। ওর বাবা জাস্টিস রণেন মিত্র সোফার এক কোণে বসে টাইম ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। স্বপ্নার বাবা-মা বিকেলে ফিরেছেন কৃষ্ণনগর থেকে। টুপুলদের সঙ্গে ওর দেখা হওয়া থেকে শুরু করে ওদের বিপদের কথা বাবাকে সব খুলে বলেছে স্বপ্না। সবশেষে জানতে চেয়েছে, এখন আমরা কি করবো বাবা?

জাস্টিস মিত্র কিছুক্ষণ ভাবলেন পুরো বিষয়টা নিয়ে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, তুমি রাতে ওর টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করবে। আমি তোমার সুকুমার কাকুকে ঘটনাটা জানিয়ে দিচ্ছি।

যদি ওরা রাতে টেলিফোন করতে না পারে? যদি ওদের অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়?

তাহলে খুঁজে বের করা কঠিন হবে–চিন্তিত গলায় বললেন জাস্টিস মিত্র। তবে তোমার কাছে যখন ওদের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ঠিকানা আছে সেখানে হানা দিলে সুকুমাররা নিশ্চয় কোনো-না-কোনো তথ্য পাবে।

সুকুমার বসু কলকাতার পুলিশ কমিশনার, স্বপ্নার বাবার খুড়তুতো ভাই, প্রায়ই বেড়াতে আসেন এ বাড়িতে।

স্বপ্না জানতো, বাবাকে বললে তিনি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন। বাবার সঙ্গে সুকুমার কাকুর কি কথা হয়েছে ও শোনেনি। শোনার মতো হলে ওকে ঠিকই বলা হতো। বাবা আর সুকুমার কাকু দায়িত্ব নেয়াতে স্বপ্নার উদ্বেগের বোঝা কিছুটা হালকা হলো। তবু দুশ্চিন্তা থেকেই গেলো–যদি টুপুলদের অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়, তখন কি হবে!

গত রাতে টেলিফোন এসেছিল তিনটার দিকে। আজও কি রাত তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? স্বপ্না যদি নিশ্চিন্ত হতো টুপুল টেলিফোন করবেই তাহলে সারারাত জেগে থাকতেও বরং খারাপ লাগতো না। অনিশ্চয়তার কারণে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছিলো। জাস্টিস মিত্র পত্রিকা পড়লেও মেয়ের অস্থিরতা তাঁর নজর এড়ায়নি। এক ঘন্টার ভেতর স্বপ্না দুবার উঠে খাবার ঘরে গেছে পানি খেতে, কিছুক্ষণ বাইরের বারান্দায় পায়চারি করেছে, কখনো বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে আনমনেসবই তিনি লক্ষ্য করেছেন। নরম গলায় স্বপ্নাকে বললেন, তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন? টেলিফোন না এলেও আমরা তোর বন্ধুদের খুঁজে বের করবো।

বদমাশগুলো যদি টুপুল আর জয়কে মেরে ফেলে?

মনে হয় না। মারার ইচ্ছে থাকলে প্রথমেই মারতো। বাঁচিয়ে যখন রেখেছে নিশ্চয় কোন মতলব আছে।

তোমার কি ধারণা ওরা ও বাড়িতেই আছে?

তাই তো মনে হয়।

সরিয়ে যে ফেলে নি সিওর হচ্ছে কিভাবে?

খুব ছোট ছেলে তো নয়। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নেয়ার অনেক ঝামেলা।

বাবার কথা শুনে স্বপ্নার উদ্বেগ কিছুটা কমলো। দেয়ালঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো একটা চল্লিশ। বললো, বাবা তুমি কফি খাবে?

তোর খেতে ইচ্ছে করলে আমিও খেতে পারি।

স্বপ্না মৃদু হেসে ডাইনিং রুমে গেলো। টেবিলের ওপর ফ্ল্যাস্কে গরম পানি রেখে গেছেন মা। বলেছেন চা কফি খেতে ইচ্ছে করলে বানিয়ে খেতে। ওর ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়েছেন। স্বপ্নার বন্ধুদের জন্য তিনিও কম চিন্তিত ছিলেন না।

রাত দুটো দশ মিনিটে টুপুলের টেলিফোন এলো। একবার রিং রাজতেই স্বপ্না ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললো। টুপুল হতাশাভরা গলায় বললো, আমাদের ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি, স্বপ্না। বাড়ির লোকেশানটা কোথায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাছাকাছি ট্রাম রাস্তা আছে? শব্দ শুনেছো?

না ট্রামের শব্দ শুনি নি। পুর্বদিকে কালো রঙের বড় একটা ওভারহেড ট্যাঙ্ক আছে। এ ছাড়া আশেপাশে উঁচু কিছু চোখে পড়ে নি।

বাড়িটা কি রকম?

পুরোনো ধাঁচের । দোতালা। চারপাশে বাগান। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের ওপর রূপোলি রঙের কাঁটাতারের ঘেরা, চারদিকে দেবদারু গাছের ঘন সারি বাড়িটাকে আশেপাশের এলাকা থেকে আড়াল করে রেখেছে।

আর কিছু বলতে পারবে?

বাড়ির বাইরের রঙ লাইট গ্রীন, জানালা-দরজা ক্রিম কালারের।

বাউন্ডারি ওয়ালের রঙ কি?

ভেতরের দিকটা ক্রিম, বাইরেরটা বলতে পারছি না। যে আমাদের আটকে রেখেছে। তার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তার নাম হরিপ্রসাদ আগরওয়ালা। টুপুল এতক্ষণ চাপা গলায় কথা বলছিলো। হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করে স্বাভাবিকভাবে বললো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না স্বপ্না। বাড়ি গিয়েই লিখবো। রাখি তাহলে।

ওপাশ থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখতেই স্বপ্না বুঝলো ফোন করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। টুপুল ফোনে কি বলেছে বাবাকে বললো। জাস্টিস মিত্র বললেন, তুমি এবার ঘুমোতে যেতে পারো। আশা করি কাল সকালেই তোমার বন্ধুদের উদ্ধার করতে পারবো।

বাবার কথার কোন প্রতিবাদ না করে স্বপ্না ওর ঘরে গিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকলো। টুপুল যে ধরা পড়ে গেলো–ওকে কি ওরা মারধোর করবে? ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত কথাটা সারাক্ষণ ওর মাথায় ঘুরপাক খেলো।

স্বপ্নাকে টেলিফোন করার জন্য ঘর থেকে একাই বেরিয়েছিলো টুপুল। জয়ের শরীর খারাপ বলা হয়েছে, ওকে বাইরে দেখলে বুঝে ফেলবে যে ও আসলে অসুস্থ নয়। টেলিফোনে স্বপ্নাকে হরিপ্রসাদের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলো সে এদিকেই আসছে। নিশ্চয় আগে ওদের ঘরে উঁকি মেরে দেখেছে ও যে বিছানায় নেই।

শেষের কথাগুলো হরিপ্রসাদকে শোনাবার জন্য জোরেই বলেছিলো। তারপর যেন ওকে এইমাত্র দেখেছে–তড়িঘড়ি রিসিভার রেখে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলো।

কাকে ফোন করেছে। কাটা কাটা প্রশ্ন হরিপ্রসাদের।

আমার বন্ধু স্বপ্না। ভয়–পাওয়া গলায় জবাব দিলো টুপুল।

কি বলেছো ওকে?

বলেছি কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। জয় অসুস্থ বলে আজ ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। দেশে গিয়ে ওকে চিঠি লিখবো।

বন্ধুকে টেলিফোন করবে, লুকিয়ে এত রাতে কেন?

জয় অসুস্থ বলে মনে ছিলো না। স্বপ্নাকে ফোন না করলে ও চিন্তিত হতে পারে সেজন্য..

তুমি কথা লুকোচ্ছো পাজি ছেলে। কাছে এসে হরিপ্রসাদ ঠাস করে চড় মারলো টুপুলের গালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ফর্সা গালে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ফুটে উঠলো, যন্ত্রণায় চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এলো।

আমি কোনো কথা লুকোই নি। বিশ্বাস না হলে নম্বর দিচ্ছি, আপনি ওকে টেলিফোন করুন।

আমি কেন ওকে ফোন করবো কমবখত? এই বলে হরিপ্রসাদ টুপুলের চুলের ঝুটি ধরে হিড় হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে ওদের ঘরে ঢোকালো। ফের যদি ঘর থেকে বেরোতে দেখি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

টুপুলকে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে হরিপ্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। টুপুল টের পেলো বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিছানায় শুয়ে রাগে, অপমানে, হতাশায় টুপুল হু হু করে কেঁদে উঠলো। ওর কান্নার শব্দে জয়ের ঘুম ভেঙে গেলো। ছুটে এসে টুপুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলো–কি হয়েছে টুপুল, এভাবে কাঁদছিস কেন?

শুয়োরের বাচ্চা হরিপ্রসাদ আমাকে চড় মেরেছে। স্বপ্নাকে ফোন করেছি, ও দেখে ফেলেছে। কান্না চেপে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো টুপুল।

জয় সান্তনার গলায় বললো, তুই কি ভেবেছিস আমরা এই বদমাশদের ছেড়ে দেবো? কাল যখন আমাদের নিয়ে বাইরে যাবে, পুলিশ দেখলেই চিৎকার করে বলবো আমাদের কিডন্যাপ করেছে। থানায় গিয়ে হরিপ্রসাদ, প্রতুল সব কটাকে ধরিয়ে দেবো।

থানার লোকেরা কি আমাদের ছেড়ে দেবে? টুপুল ভেজা গলায় বললো, ভুলে যাচ্ছিস কেন আমরাই ওদের হেরোইন বয়ে এনেছি। তার ওপর ইন্ডিয়া এসেছি বিনা পাসপোর্টে।

তাতে কি হয়েছে? এত বড় একটা গ্যাং ধরিয়ে দিচ্ছি, এটা কম কি! স্বপ্নার বাবা হাইকোর্টের জাস্টিস। তিনি নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন।

জয়ের কথায় মোটেই ভরসা পেলো না টুপুল। পুলিশকে বললেই কি ওরা হরিপ্রসাদ আর প্রতুলকে অ্যারেস্ট করবে? হেরোইন কি ওদের কাছে আছে? কিভাবে প্রমাণ করবে এদের মত গণ্যমান্য লোক হেরোইনের ব্যবসা করে? পুলিশ ওদের কিছুই করতে পারবে, বরং বিনা পাসপোর্টে ইন্ডিয়া আসার জন্য টুপুলদেরই জেলে ঢুকিয়ে দেবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে এমন দুর্গতি হবে জানলে জীবনেও ওরা পালাবার নাম করতো না।

শেষ রাতের দিকে টুপুল আর জয় ঘুমিয়েছিলো। কিছুক্ষণ পরই ওদের কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলো হুইসেল আর বন্দুকের গুলীর শব্দে। পর পর তিনবার বন্দুকের শব্দ শুনে ওরা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো। করিডোর ভারি বুটজুতো পরে কয়েকজনকে দৌড়ে যেতে শুনলো। টুপুল উত্তেজিত গলায় বললো, পুলিশ রেইড করেছে।

জয় বললো, এখন বের হওয়া চলবে না। শয়তানগুলো আগে সব কটা ধরা পড়ুক।

ওর কথা শেষ না হতেই আবার বন্দুকের শব্দ শুনলো, বাইরে মাইকের শব্দ হলো–সবাই হাত তুলে বেরিয়ে এসো, আগারওয়ালারা ধরা পড়েছে।

টুপুলদের ঘরের দরজা খোলাই ছিলো। হাতে পিস্তল হাতে ছুটে এলো দশাসই শরীরের কেয়ারটেকার দুবে। ভেতরে ঢুকে পিস্তল উঁচিয়ে বললো, মাথার ওপর হাত তুলে এক পা এক পা করে ঘর থেকে বেরোও শয়তানরা। বেশি চালাকি করতে চাইলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

টুপুল আর জয় হতভম্ব হয়ে মাথার ওপর হাত তুললো। তারপর দুবের কথামতো ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরোলো। বাইরে তখন সূর্য না উঠলেও আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। পুবের আকাশে সিঁদুরের ছোপ লেগেছে। গাড়ি বারান্দার নিচে এসে দুবে চিৎকার করে বললো, কেউ আমাকে বাধা দিলে এই ছেলে দুটোর মাথার খুলি উড়ে যাবে।

বাগানের লনে কয়েকজন পুলিশসহ দুজন মাঝবয়সী অফিসার ছিলেন। একজন রিভলবার তুলতেই বয়স্ক অফিসার ইশারায় বাঁধা দিলেন। দুবে সেটা লক্ষ্য করলো। টুপুলদের কিছুই করার নেই। অসহায় ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে ওরা গেট-এর দিকে এগিয়ে গেলো। দুবের ঠোঁটের ফাঁকে বিজয়ীর হাসি।

গেটের কাছে জিপে আগওয়ালারা দুই ভাই বসেছিল। দুবে জিপের কাছে এসে ড্রাইভারকে বললো, চাবি রেখে এক্ষুণি নেমে পড়ো।

আগাওয়ালদের চেহারা থেকে হতাশার কালো মেঘ সরে গেলো। ওয়েল ডান দুবে বলে হরিপ্রসাদ ধাক্কা মেরে ড্রাইভারকে জিপ থেকে ফেলে দিলো। তারপর নিজেই ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো।

ঠিক তখনই গুলীর শব্দ হলো। দুবের হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়লো। আই বাপ বলে রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে দুবে মাটিতে গড়াগড়ি খেলো। তীব্র গতিতে একটা জিপ এসে হরিপ্রসাদের জিপের সামনে এসে দাঁড়ালো।

লনে যে দুজন বয়স্ক পুলিশ অফিসার ছিলেন তারা এসে আগরওয়ালাদের দুই ভাই আর দুবেকে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জীপ থেকে একজন তরুণ অফিসার নেমে টুপুলদের কাছে এসে বললো, তোমরা নিশ্চয় জয় আর টুপুল। আমার সঙ্গে এসো।

ঢোক গিলে জানতে চাইলো টুপুল–কোথায়?

হাসি মুখে অফিসার জানালো–জাস্টিস মিত্র-র বাড়িতে। কমিশনার এস. বোসও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে টুপুল আর জয় একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর হাতকড়া পরানো হরিপ্রসাদের কাছে গিয়ে ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মেরে টুপুল বললো, এটা তোমরা পাওনা ছিলো কমবখত। জয় আরেকটা চড় মেরে বললো, এটা হচ্ছে বোনাস।

স্বপ্নাদের বাড়িতে নাশতা খেতে খেতে টুপুল বললো, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো বাড়ির লোকেশন সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি নি। পুলিশ খবর পেলো কি করে?

জাস্টিস মিত্র মৃদু হেসে বললেন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে বলা হয়েছিলো, আমার বাড়িতে মাঝরাতে যে কলটা আসবে ওটা ডিটেক্ট করতে। তুমি যখন টেলিফোন করলে এক্সচেঞ্জওয়ালারা বুঝে ফেললো ওটা আগরওয়ালার বাড়ি থেকে হচ্ছে। আনোয়ার শাহ রোডে ওদের বাড়ি কে না চেনে?

আমাদের কিডন্যাপ করাটা তো বড় অপরাধ নয়। ওদের আসল কারবার তো হেরোইনের। সেটাই প্রমাণ করা গেলো না।

কে বললো গেলো না? মোটাসোটা পুলিশ কমিশনার বোস হাতে-ধরা পাইপে লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোয়া ছেড়ে বললেন, তোমার টেলিফোনের পর হরিপ্রসাদ প্রতুল সাহাকে ফোন করে বলেছে ও হেরোইনের কমিশনের টাকা পাঠায় নি বলে তোমাদের দুজনকে ফেরত পাঠাতে পারছে না। যদি দুঘন্টার মধ্যে ও টাকা পাঠায়, ওর অনুরোধ বিবেচনা করবে।

প্রতুল সাহা কি ধরা পড়েছে?

শুধু ধরা পড়া নয়। ওর বাড়িতে সোনার খনি পাওয়া গেছে। হা হা করে হাসলেন কমিশনার।

সোনার খনি মানে? টুপুল আর জয়ের চোখ দুটো মার্বেলের মতো গোল হয়ে গেলো।

খনি মানে তাল তাল সোনা। কম করে হলেও টন খানেক হবে। সবই হেরোইন বেচা সোনা।

জয় এবার আসল কথা পাড়লো। স্বপ্নার বাবাকে বললো, আমরা তো বিনা পাসপোর্টে ইন্ডিয়া এসেছি। তার কি হবে?

তোমাদের আমি চৌদ্দ বছরের জেল আর চৌদ্দবার ফাঁসি দেবো। গম্ভীর গলায় বললেন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ কমিশনার বোস।

এ্যাঁ। টুপুল আর জয়ের মুখ সাদা হয়ে গেলো। স্বপ্না যে ওঁর কথায় মুখ টিপে হাসছিলো সেটা ওদের নজরে পড়লো না।

জাস্টিস মিত্র মৃদু হেসে বললেন, আমি বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছি। আজই তোমাদের পাসপোর্ট ভিসা রেডি হয়ে যাবে।

আসলে তোমরা পাসপোর্ট নিয়েই এসেছিলে। কমিশনার বোস বললেন, মনে করো ওটা হারিয়ে ফেলেছে। তাই নতুন করতে হচ্ছে।

স্বপ্না বললো, এভাবে না হলে তোমরা ঝামেলায় পড়বে।

পরদিন কোলকাতার সব কাগজে দুই বাংলাদেশী তরুণের দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ ছাপা হলো, যাদের সাহায্যে কোলকাতার পুলিশ দুই দুর্ধর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আর তাদের চক্রকে গ্রেফতার করেছে। কয়েকটা পত্রিকায় জয় আর টুপুলের ছবিও বেরিয়েছে।

বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জানালেন, রাজশাহী সার্কিট হাউস থেকে নাজমুল আবেদিনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। টুপুলদের ও মিথ্যে পরিচয় দিয়েছে বিপ্লবী নেতা বলে। আসলে ও একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের খুনীদের দলের এক বড় পাণ্ডা, গোপনে হেরোইন ব্যবসা করতো।

সাতদিন পর ডেপুটি হাই কমিশনারের সার্কাস এভিনিউর বাড়িতে চমৎকার এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছিলো। জয় আর টুপুল স্বর্ণ উদ্ধারের কমিশন পেয়ে তখন অনেক টাকার মালিক। হাই কমিশনার বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে জয়ের বাবা-মা, টুপুলের বাবা আর ওদের স্কুলের হেডমাস্টার ব্রাদার মার্টিনকে কলকাতা এনেছেন। যেদিন পার্টি সেদিন বিকেলের ফ্লাইটেই এসেছেন ওঁরা সবাই।

ব্রাদার মার্টিন তার স্কুল টিমের দুই কৃতি ফুটবলারকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বললেন, সব শুনছি। সবই ঠিক আছে। মাঝে মধ্যে বাড়ি থেইক্যা পলাইয়া যাওনও ভালো। তয় পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়া মোটেই ভালো না।

জয় আর টুপুল দুজনই বললো, আমরা আর কখনও দশের নিচে নামবো না।